6

অর্থ ও মুদ্রাব্যবস্থা
(Money and Monetary Systems)

★ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ★

কোন দেশের অর্থনীতিতে অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এখন এই অর্থ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। অর্থ কাকে বলে, অর্থের উদ্ভব কখন হ'ল, অর্থের বিবর্তন, বিভিন্ন ধরনের অর্থ, অর্থের কাজ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব। বর্তমানে সমস্ত দেশেই কাগজি মুদ্রা প্রচলিত আছে। এই কাগজি মুদ্রার সুফল, কুফল এবং কাগজি মুদ্রা প্রচলনের নীতি ও পদ্ধতি নিয়েও আমরা আলোচনা করব। কাগজি মুদ্রার ব্যাপক প্রচলনের পূর্বে অনেক দেশেই স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। স্বর্ণমানের বিভিন্ন দিক নিয়েও আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

6.1. অর্থ কাকে বলে?
(What is Money?)

অর্থের সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন্ কোন্ সম্পত্তিকে অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে সে সম্পর্কে কোন ঐক্যমত নেই। তবে সকলেই এটা স্বীকার করেন যে, **যে সম্পত্তিটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হবে অর্থাৎ যেটি সকলেই নিতে রাজি আছে তাকেই অর্থ বলা হবে** (Money is anything which acts as a medium of exchange)। লেনদেনের সময় যে জিনিসটি সকলেই নিতে রাজি আছে অর্থাৎ যার **সার্বজনীন** গ্রহণযোগ্যতা (general acceptability) আছে তাকেই অর্থ বলা যেতে পারে। **সার্বজনীন** গ্রহণযোগ্যতা **আইন বলে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে।** সরকার আইনের মাধ্যমে কোন দ্রব্যকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন। ঐ দ্রব্যের মাধ্যমে পাওনা নিতে বা দেনা শোধ করতে সবাই আইন অনুযায়ী বাধ্য। **এই রকম অর্থকে** আইনসিদ্ধ **অর্থ** (legal money) **বলা হয়। আবার কোন দ্রব্যের পিছনে আইনগত সমর্থন না থাকলেও প্রথার ভিত্তিতে ঐ দ্রব্য** জনসাধারণ **কর্তৃক স্বীকৃত হ'তে পারে।** যেমন এক সময়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কড়ি ব্যবহৃত হ'ত। **এই ধরনের অর্থকে প্রথাসিদ্ধ অর্থ** (customary money) **বলা হয়।** যেহেতু ধাতুমুদ্রা (coins), কাগজি নোট (currency notes) এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চলতি আমানত লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে বহুল প্রচারিত এবং এগুলি প্রায় সকলেই গ্রহণ করতে রাজি থাকে। সেজন্য চিরাচরিত সংজ্ঞা অনুযায়ী এগুলিকেই অর্থ বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন কেউ কেউ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সঞ্চয় আমানতকে আবার কেউ কেউ মেয়াদী আমানতকে অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

6.2. অর্থের উদ্ভব কখন হ'ল?
(When Did Money Arise?)

মানব সভ্যতার শুরুতে কোন অর্থের প্রচলন ছিল না। তখন প্রতিটি পরিবারই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট। নিজেদের অভাব মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী নিজেরাই উৎপাদন করত। মানুষের অভাব ছিল সীমিত। প্রতিটি পরিবার নিজের যতটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই উৎপাদন করত। উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজে ভোগ করা। বিনিময়ের উদ্দেশ্যে বাড়তি কিছু উৎপাদন হত না। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে

মানুষের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের ভোগের বৈচিত্র্য ঘটেছে। শুধুমাত্র নিজের উৎপাদনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। নিজে যে দ্রব্য উৎপাদন করেছে শুধু সেই দ্রব্য ভোগেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। তার চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এমন দ্রব্যের জন্য যেগুলি সে উৎপাদন করেনি। এই রকমের চাহিদা মেটানোর জন্য তাকে নিজের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি উৎপাদন করতে হয়েছে এবং বাড়তি উৎপাদনের বিনিময়ে অপর জনের উৎপাদিত দ্রব্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। সভ্যতা যত বিস্তার লাভ করেছে তত শ্রম বিভাগ প্রসারিত হয়েছে এবং তত দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু বিনিময় ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হ'ল যে কোন মানুষ যদি ধানের বিনিময়ে কাপড় পেতে চায় তাহলে তাকে এমন লোক খুঁজে পেতে হবে যে কাপড়ের বিনিময়ে ধানই পেতে চায়। কাপড় উৎপাদনকারী ব্যক্তির যদি ধানের প্রয়োজন না থাকে তাহলে তার কাপড়ের সাথে ধান উৎপাদনকারীর ধানের সরাসরি বিনিময় হবে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই অর্থের ব্যবহার শুরু হয়। অর্থ সকলেই নিতে রাজি থাকে। ধান উৎপাদনকারী ধান বিক্রি করে অর্থ পাবে। সেই অর্থ দিয়ে কাপড় উৎপাদনকারীর কাছ থেকে কাপড় কিনবে। কাপড় উৎপাদনকারী এই অর্থ দিয়ে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারবে। এইভাবে **সভ্যতার বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে যখন শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ন প্রচলিত হচ্ছে তখনই দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধা দূর করার জন্য অর্থের উদ্ভব হয়েছে।**

6.3 দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধা (Difficulties of the Barter System)

দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য একটি দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া। **অর্থ ছাড়াই দ্রব্যের সাথে দ্রব্যের বিনিময়কে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা বলে।** অর্থের আবির্ভাবের আগে এই ধরনের দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার কতকগুলি অসুবিধা ছিল। সেজন্য অর্থের উদ্ভব ঘটে। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার কতকগুলি অসুবিধা ছিল। সেজন্য অর্থের উদ্ভব ঘটে। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার নিম্নলিখিত **অসুবিধাগুলি** উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার জন্য পারস্পরিক অভাবের দ্বৈত সমাপতন (Double coincidence of wants) **দরকার।** উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক একজন ব্যক্তি ধান উৎপাদন করেছে। তার চাই কাপড়। সে তার উৎপন্ন ধানের বিনিময়ে কাপড় নেবে। এজন্য তার প্রয়োজন এমন একজন কাপড় উৎপাদনকারী যে কাপড়ের বিনিময়ে ধান পেতে চাইবে। যদি কাপড় উৎপাদনকারীর ধান প্রয়োজন না হয় তাহলে ধান উৎপাদনকারী সরাসরি বিনিময়ের মাধ্যমে কাপড় পেতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের অবিভাজ্যতাও দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় অসুবিধার সৃষ্টি করে। অনেক দ্রব্য আছে যাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায় না। বিক্রি করতে হ'লে দ্রব্যটি গোটাই বিক্রি করতে হয়। এক্ষেত্রে বিনিময় করার সময় অসুবিধা দেখা দেবে। ধরা যাক একজন মেষ পালকের অনেক ভেড়া আছে ; সে একটি ভেড়ার বিনিময়ে চাল পেতে চায়। ধরা যাক একটি ভেড়ার বিনিময় মূল্য 2 কুইন্টাল চালের সমান। মেষ পালককে বিনিময়ের জন্য এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে যে চালের বিনিময়ে ভেড়া পেতে চাইছে। আবার শুধু তাই নয়। মেষ পালকের যদি 2 কুইন্টাল চাল প্রয়োজন না হয় তাহলেও তাকে ঐ পরিমাণ চালই নিতে হবে কারণ ভেড়াটিকে তো আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে বিনিময় করা যাবে না। (চাল বিক্রেতা ধরা যাক গোটা ভেড়াটাই পেতে চাইছে।) দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় মেষ পালককে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস কিনতে হচ্ছে দ্রব্যের অবিভাজ্যতার জন্য। এটি এক ধরনের অপচয়। অর্থের ব্যবহারের ফলে এই অপচয় রোধ করা যাবে।

তৃতীয়ত, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় সকল দ্রব্যের মূল্যের পরিমাপের কোন সাধারণ মানদণ্ড নেই। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় কোন দ্রব্যের মূল্য সেই দ্রব্যের এক ইউনিটের বদলে অন্য দ্রব্য কত ইউনিট পাওয়া যায়

তার সঙ্গে সমান। বিভিন্ন দ্রব্যের মাপকাঠিতে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ যদি বাজারে 10টি দ্রব্য থাকে তাহলে যেহেতু যে কোন দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি করে বিনিময় হার হবে, সুতরাং বাজারে মোট $\frac{10\times9}{2}$ বা 45টি বিনিময় হার পাওয়া যাবে। [সাধারণভাবে যদি বাজারে n-টি দ্রব্য থাকে তাহলে ${}^{n}C_{2}$ বা $\frac{n(n-1)}{2}$টি বিনিময় হার পাওয়া যাবে।] অন্যদিকে এই 10টি দ্রব্যের দাম যদি অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তাহলে 10টি দাম পাওয়া যাবে।

চতুর্থত, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় সঞ্চয় করার অসুবিধা আছে। পচনশীল দ্রব্যকে সঞ্চয় করা যায় না। এগুলিকে উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই বিনিময় করতে হবে। আবার গরু, ছাগল ইত্যাদি দ্রব্য হয়তো সঞ্চয় করা যায় কিন্তু তাতেও একটা খরচ আছে। কিন্তু অর্থের প্রচলন হলে অর্থই হবে সঞ্চয়ের বাহন। অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করা যাবে।

পঞ্চমত, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় সমাজের মোট উৎপাদনের হিসাব করা কঠিন কারণ সমস্ত দ্রব্যকে একটি সাধারণ মানদণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু যখন অর্থের প্রচলন হয় তখন সমস্ত দ্রব্যের মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এবং সেগুলিকে যোগ করে সমাজের মোট উৎপাদনের মূল্য সহজেই হিসাব করা যায়।

ষষ্ঠত, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় উৎপাদককে তার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করতে বেগ পেতে হয় কারণ তাকে খুঁজে বের করতে হবে এমন ব্যক্তিকে যে তার দ্রব্যটিকে নিতে রাজি এবং তার যে দ্রব্য দরকার সেটি দিতে রাজি। এজন্য প্রতিটি উৎপাদকেরই বাজার থাকে সীমিত। ফলে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয় না। অন্যদিকে অর্থের প্রচলনের ফলে বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে এবং অধিক উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

সমস্ত বিনিময়ই যে জটিল এবং সময়সাপেক্ষ তা কিন্তু নয়। অর্থের প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু সহজ বিনিময় দেশে চালু থাকতে পারে। যেমন কৃষিতে যখন শ্রমিককে মজুরি দেওয়া হয় শস্যের মাধ্যমে বা ভাগচাষী যখন শস্যের মাধ্যমে জমির খাজনা দেয়, তখনও এটি একটি বিনিময়, কারণ এই লেনদেনে অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে না। এই ধরনের সরল বিনিময় অর্থ ব্যবহারকারী অর্থনীতিতেও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। কিন্তু সমাজের মোট লেনদেনের অতি ক্ষুদ্র অংশই এই ধরনের সরল বিনিময়ের মাধ্যমে সাধিত হয়। বস্তুত, ব্যাপক আকারে বিনিময় ব্যবস্থা বর্তমানে পৃথিবীর কোন দেশেই আর দেখা যায় না।

6.4. অর্থের কাজ
(Functions of Money)

বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি দূর করার জন্যই অর্থের প্রচলন হয়েছে। অর্থের কাজ সম্পর্কে একটি ছোট ইংরাজি ছড়া আছে।

"Money is a matter of functions four,
A medium, a measure, a standard, a store."

এটিকে বাংলায় রূপান্তর করলে হবে নিম্নরূপ ঃ

'অর্থ নামে বিষয়ের কার্য চতুষ্টয়।
মাধ্যম, মাপ, মান ও মূল্যের সঞ্চয়।"

এই ছড়ার মাধ্যমেই **অর্থের চারটি প্রধান কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। সেই চারটি কাজ হ'ল ঃ (1) বিনিময়ের মাধ্যম, (2) মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, (3) ঋণ শোধের বা পরে মূল্য পরিশোধের মাপকাঠি এবং (4) সঞ্চয়ের উপায়।** এই চারটি কাজকে আমরা একে একে ব্যাখ্যা করতে পারি।

❶ **বিনিময়ের মাধ্যম** (Medium of exchange) : অর্থের প্রধান কাজ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধা দূর করার জন্যই অর্থের প্রচলন। যে সম্পত্তি লেনদেনের

সময়ে সকলেই গ্রহণ করতে রাজি থাকে তাকেই আমরা অর্থ বলি। অর্থের সাহায্যে লেনদেন হলে পারস্পরিক অভাবের দ্বৈত সমাপতন (Double coincidence of wants) প্রয়োজন হয় না। ধান উৎপাদক কাপড় কিনতে চাইলে তাকে এখন এমন কাপড় উৎপাদককে খুঁজে বার করতে হবে না যে ধান কিনতে চাইবে। ধান উৎপাদক ধান বিক্রি করে অর্থ পাবে। সেই অর্থ দিয়ে ধান উৎপাদক বাজার থেকে কাপড় কিনবে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা থাকায় লেনদেনের কাজটি অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়। দ্রব্য বিনিময়ের সময় যে অপচয় ঘটে, অর্থের ব্যবহারের ফলে সেই অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ব্যবহারের ফলে অধিকতর শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ন সম্ভব হয়। এতে মোট উৎপাদন বাড়ে।

❷ পরিমাপের **মানদণ্ড** (Unit of account) : দেশের মধ্যে নানা ধরনের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপন্ন হয়। প্রতিটি দ্রব্যের মাপের একক বিভিন্ন। এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীকে যদি একটি সাধারণ মাপকাঠিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে অর্থের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য আমরা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করি। অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত মূল্যগুলিকে যোগ করে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর মোট মূল্য আমরা হিসাব করতে পারি। জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য এই ধরনের মানদণ্ড অবশ্যই প্রয়োজন। আবার মনে করা যাক কোন যৌথ মূলধনি কোম্পানি নানা ধরনের দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রি করে। এই কোম্পানির মোট বিক্রয় (বা, মোট রেভিনিউ) কত হ'ল তা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করেই বলা যাবে। দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যকে অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করার ফলে বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর তুলনা করা সম্ভব।

অর্থ ব্যবহারকারী অর্থনীতিতে আমরা সব দ্রব্যের দামই অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করি। এতে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় প্রচুর বিনিময় অনুপাত পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থের মাধ্যমে যখন দাম প্রকাশিত হয় তখন যতগুলি দ্রব্য ততগুলিই দাম পাওয়া যায়।

অর্থের মাধ্যমে মূল্য পরিমাপের একটি অসুবিধাও আছে। অর্থের নিজের মূল্য (দ্রব্যের অঙ্কে) একই থাকলে তবেই অর্থের মাধ্যমে মূল্য পরিমাপ হবে সঠিক। কিন্তু অর্থের মূল্যে ওঠা নামা হয় দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে। দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়লে অর্থের মূল্য কমে, আবার-দ্রব্য সামগ্রীর দাম কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে। অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের ফলে অর্থের মাধ্যমে মাপা দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য সকল সময়ে সঠিক হয় না।

❸ **পরে মূল্য শোধের মাপকাঠি** (Standard of deferred payments) : পরে বা ভবিষ্যতে যে পাওনা মেটানো হবে তার মাপকাঠি হিসাবেও অর্থ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময়ে ভবিষ্যতে দাম মেটানোর ভিত্তিতে উৎপাদনের উপাদান নিয়োগ করা হয়। খাজনা, মজুরি, সুদ এই সমস্ত চুক্তিবদ্ধ পাওনা অর্থের মাধ্যমেই স্থির হয়। ঋণ নেওয়া, ভবিষ্যতে ঋণ শোধ দেওয়া প্রভৃতি অর্থের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এইভাবে অর্থের মাধ্যমে বর্তমান বাজারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ বাজারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

অর্থের মূল্য ওঠানামার ফলে পরে মূল্যশোধের মাপকাঠি হিসাবে অর্থের ব্যবহার ত্রুটিযুক্ত হয়ে থাকে। মনে করা যাক 5000 টাকা ধার নেওয়া হ'ল কোন বছরে। এই 5000 টাকা ধরা যাক 5 বছর বাদ শোধ দেওয়া হ'ল। টাকার অঙ্কে সমমূল্য শোধ দেওয়া হ'ল। কিন্তু এই পাঁচ বছরে দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর যদি বেড়ে যায় অর্থাৎ যদি অর্থের মূল্য কমে যায় তাহলে 5000 টাকা শোধ দিলে প্রকৃতপক্ষে (অর্থাৎ দ্রব্যের অঙ্কে) কম মূল্য শোধ দেওয়া হচ্ছে।

❹ **মূল্যের সঞ্চয়** (Store of value) : অর্থ সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। জনসাধারণ তাদের সঞ্চয় অর্থের মাধ্যমে রাখতে পারে। **দুভাবে অর্থ মূল্যের সঞ্চয় হিসাবে কাজ করে।** **প্রথমত,** দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় কোন দ্রব্য বিক্রি এবং অপর কোন দ্রব্য কেনা একই সঙ্গে হয়ে থাকে, কারণ একটি দ্রব্যের বিনিময়েই অন্য দ্রব্য পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থ ব্যবহারের ফলে কেনা ও বেচা

এই দুটি কাজকে পৃথক করা সম্ভব। কোন দ্রব্য বিক্রি করে উৎপাদক অর্থ পেল। ঐ অর্থ সঙ্গে সঙ্গে অন্য দ্রব্য কিনতে ব্যয় না হতে পারে। আবার ঐ অর্থের পুরোটাই অন্য দ্রব্য কিনতে ব্যয়িত না হ'তে পারে। একটা অংশ সঞ্চয় হ'তে পারে। এই অংশটি মূল্যের সঞ্চয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। **দ্বিতীয়ত,** লোকেরা আয় করে একটা নির্দিষ্ট সময় বাদে। যেমন মাসে একবার বা সপ্তাহে একবার করে আয় হয়। কিন্তু ব্যয় করতে হয় সারা মাস ধরে বা সারা সপ্তাহ ধরে। লোকেরা আয় করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অর্থ ব্যয় করে না। আয়ের একটি অংশ অর্থের আকারে রেখে দেয়। এই অংশটি মূল্যের সঞ্চয় হিসাবে কাজ করে। অবশ্য সঞ্চয় অর্থের আকারে না রেখে অন্য সম্পত্তির আকারেও রাখা যেতে পারে। তবে সঞ্চয় অর্থের আকারে রাখার কতকগুলি সুবিধা আছে। যেমন অর্থ সব থেকে নগদ সম্পত্তি (most liquid asset)। (যে সম্পত্তিকে ক্ষতি স্বীকার না করে, যত দ্রুত টাকায় রূপান্তরিত করা যাবে, তাকে তত নগদ সম্পত্তি বলা হয়। এই হিসাবে অর্থকে সব থেকে নগদ বলা হয় কারণ এটি টাকায় রূপান্তরিত হয়েই আছে।) তাছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির মাধ্যমে সঞ্চয় করলে সঞ্চয়ের অর্থমূল্য বাড়তে বা কমতে পারে ঐ সম্পত্তির দামে ওঠানামা হ'লে। কিন্তু অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করলে ঐ সঞ্চয়ের অর্থমূল্য স্থির থাকে। তবে অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলে অর্থের মাধ্যমে সঞ্চিত মূল্যেরও ওঠানামা হয়ে থাকে। দ্রব্য সামগ্রীর দাম কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে এবং অর্থের মাধ্যমে সঞ্চিত সম্পদের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়লে অর্থের মূল্য কমে এবং অর্থের মাধ্যমে সঞ্চিত সম্পদের প্রকৃত মূল্য কমে।

6.5. অর্থের বিবর্তন
(Evolution of Money)

অর্থ কবে আবিষ্কৃত হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। সুদূর অতীত কাল থেকেই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের প্রচলন। অর্থের আবিষ্কারকে মানব সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দ্রব্যকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হতো। **কোন দ্রব্যকে যদি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয় তবে তাকে দ্রব্য-অর্থ** (Commodity-money) বলা হয়। এক একটি দ্রব্য-অর্থের ব্যবহার এক একটি বিশেষ এলাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল। কোন্ দ্রব্যটিকে অর্থ হিসাবে বেছে নেওয়া হবে তা অনেক কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করতো যেমন জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের স্তর প্রভৃতি। উদাহরণস্বরূপ যে সকল জনগোষ্ঠী সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত তারা কড়ি বা শাঁখকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করত। তেমনি অরণ্যপ্রধান আফ্রিকায় হাতির দাঁত, বাঘের চামড়া, পাখির পালক ইত্যাদিকে অর্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার যেখানে পশুপালন ছিল প্রধান উপজীবিকা, সেখানে গবাদি পশুকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশুকে অর্থ হিসাবে ব্যবহার করার রেওয়াজ এখনও কোন কোন অনুন্নত জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়।

অভিজ্ঞতার সাহায্যে দেখা গেল যে, **কোন দ্রব্যকে বিনিময়ের আদর্শ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে গেলে সেই দ্রব্যের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার।**

প্রথমত, দ্রব্যটিকে বহন করার সুবিধা থাকা দরকার ; অর্থাৎ এটি এমন হতে হবে যেন এর ওজন কম হয়, আয়তন ছোট হয় এবং এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মূল্য নিহিত থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত, দ্রব্যটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই। কোন পচনশীল দ্রব্যকে অর্থ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। অর্থের মাধ্যমে ক্রয় শক্তি সঞ্চিত রাখা হয়। কোন পচনশীল দ্রব্যকে অর্থ আকারে গ্রহণ করলে এই ধরনের সঞ্চয় করা সম্ভব হবে না।

তৃতীয়ত, এই দ্রব্যটি হস্তান্তর করার সময় যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় এবং বস্তুটি যেন সহজে বিভাজ্য হয়। এটিকে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায়।

^ **চতুর্থত,** বিনিময়ের মাধ্যম এমন হওয়া দরকার **যেন তার বিভিন্ন ইউনিট একই রকমের** (Homogeneous) **হয়।** বিনিময়ের মাধ্যমের এককগুলি একজাতীয় না হলে সকলে তা গ্রহণ করতে চাইবে না এবং আদান প্রদানে বিঘ্ন এবং বিলম্ব দেখা দেবে।

^ **পঞ্চমত,** বিনিময়ের মাধ্যমটি এমন হওয়া দরকার **যেন এটি সহজেই লোকেরা চিনতে পারে এবং এটি যেন নকল করা বা জাল করা কঠিন হয়।**

^ **ষষ্ঠত,** যে দ্রব্যটিকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হবে সেই **দ্রব্যটি যেন দুষ্প্রাপ্য হয় এবং এর মূল্য যেন সাধারণভাবে স্থির থাকে।** বাতাস বা জল প্রভৃতি সুলভ দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হতে পারে না। আবার দ্রব্যটি এমন হওয়া দরকার যেন তার নিজস্ব মূল্য স্থির থাকা দরকার ঃ নতুবা এর মাধ্যমে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য পরিমাপ সঠিক হবে না।

বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে গেলে কোন বস্তুর যে গুণগুলি থাকা দরকার বলে আমরা বর্ণনা করলাম, এই গুণগুলি সবই আছে সরকারের সিলমোহর অঙ্কিত ধাতু মুদ্রায় অথবা সরকারের সিলমোহর অঙ্কিত কাগজি মুদ্রায়। এই ধরনের ধাতু মুদ্রা বা কাগজি মুদ্রা বহন করা সহজ, এগুলি দীর্ঘস্থায়ী। এগুলি সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এগুলি বিভিন্ন মানের হওয়ার জন্য এগুলি বিভাজ্য। এগুলির বিভিন্ন ইউনিট একই রকম হওয়ার জন্য সকলেই নিতে রাজি থাকে এবং সরকারি সিলমোহর থাকায় এগুলি জাল করা বা নকল করা কঠিন। সরকারি সিলমোহর দেখেই এগুলিকে সকলেই চিনতে পারবে। এই সমস্ত সুবিধার জন্যই ক্রমে ক্রমে ধাতু নির্মিত মুদ্রা এবং কাগজি মুদ্রার প্রচলন সব দেশেই হয়েছে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে আর এক ধরনের বিনিময়ের মাধ্যমও দেখা দিয়েছে ; সেটি হ'ল ব্যাঙ্কের আমানত। জনসাধারণ তাদের নগদ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে এবং ব্যাঙ্কের এই গচ্ছিত টাকার উপর চেক কেটে সেই চেকের মাধ্যমে লেনদেন করে। চেকের মাধ্যমে যখন লেনদেন হয় তখন প্রকৃতপক্ষে আমানতের মাধ্যমেই লেনদেন হয়ে থাকে। আমানত অর্থ আর এক ধরনের অর্থ যা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সাথে সাথে দেখা দিয়েছে। এইভাবেই আধুনিক অর্থনীতিতে কাগজি মুদ্রা, ধাতু মুদ্রা এবং ব্যাঙ্ক আমানত এই তিনটি প্রধান প্রকারের মুদ্রা গড়ে উঠেছে।

6.6. বিভিন্ন ধরনের অর্থ বা, অর্থের শ্রেণিবিভাগ (Different Types of Money or Classification of Money)

বিভিন্ন দেশে যে বিভিন্ন প্রকারের অর্থ দেখা যায় তাদের নানাভাবে শ্রেণিবিভাগ করা চলে। এই বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। **প্রথমত, প্রচলনের ভিত্তিতে** অর্থকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি **প্রকৃত অর্থ** (Actual Money) এবং অপরটি **হিসাব নিকাশের অর্থ** (Money of Accounting বা Accounting Money)। **প্রকৃত অর্থ বলতে সেই অর্থকে বোঝায় যেটি বাস্তবিকই রয়েছে এবং যেটি ধরা ছোঁওয়া যায় এবং যা লোকেদের মধ্যে হাত বদল হয়।** যেমন—**ভারতে যে বিভিন্ন ধাতব মুদ্রা বা কাগজি নোট প্রচলিত রয়েছে এগুলি প্রকৃত অর্থ।** অন্যদিকে হিসাব নিকাশের অর্থ হ'ল সেই অর্থ যে অর্থের মাধ্যমে হিসাব রাখা যায়। কোন দেশের হিসাব নিকাশের অর্থ এবং প্রকৃত অর্থ একই হতে পারে। আবার প্রকৃত অর্থ এবং হিসাব নিকাশের অর্থ আলাদাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (International Monetary Fund) এর সমস্ত হিসাবপত্র একটি মুদ্রায় প্রকাশ করা হয়। সেই মুদ্রার নাম Special Drawing Rights বা SDR। বাস্তবে কিন্তু Special Drawing Rights বা SDR নামে কোন মুদ্রা নেই। এটির অস্তিত্ব শুধু কাগজে কলমেই স্বীকৃত। যেমন বিভিন্ন দেশের টাকার নোট, পাউন্ডের নোট, ডলারের নোট ইত্যাদি আছে কিন্তু *SDR* নোট বলে কোন নোট চালু নেই। *SDR* এর অস্তিত্ব শুধুমাত্র *IMF* এর হিসাবের খাতাতেই চালু রয়েছে। এই *SDR* হিসাবী অর্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হিসাবী অর্থ শুধুমাত্র হিসাব রক্ষার কাজেই ব্যবহৃত হয়। এটির হাত বদল হয় না ; লোকেরা লেনদেনের কাজে এটিকে ব্যবহার করে না। অন্যদিকে যেটি প্রকৃত অর্থ সেটির হাতবদল হয় এবং সেটি লেনদেনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন দেশে

যদি হিসাবী অর্থ এবং প্রকৃত অর্থ আলাদা হয় তাহলে হিসাবী অর্থ এবং প্রকৃত অর্থের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিনিময়ের হার থাকে। এই বিনিময়ের হার ব্যবহার ক'রে হিসাবী অর্থকে প্রকৃত অর্থে বা প্রকৃত অর্থকে হিসাবী অর্থে রূপান্তরিত করা যায়।

যে বস্তু দিয়ে অর্থ প্রস্তুত করা হয় তার ভিত্তিতে অর্থকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। একটি ধাতব অর্থ এবং অপরটি কাগজি অর্থ। ধাতব অর্থ বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি। স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, তামার তৈরি মুদ্রা, নিকেলের তৈরি মুদ্রা ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে চালু ছিল। **ধাতু নির্মিত অর্থকে আমরা ধাতব অর্থ বলে থাকি। অন্যদিকে কাগজের নোটকে কাগজি মুদ্রা বলা হয়ে থাকে।** ধাতব মুদ্রা ব্যবহারের কতকগুলি সুবিধা আছে। সাধারণত দু'ধরনের লেনদেন চোখে পড়ে ; অল্প স্বল্প লেনদেন ও বড়সড় লেনদেন। খুচরো বা অল্প পরিমাণ লেনদেনের ক্ষেত্রে ধাতব মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু বড় ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ধাতব মুদ্রা ব্যবহার করার অসুবিধা আছে। কারণ ধাতব মুদ্রা অত্যধিক পরিমাণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া শক্ত। সেজন্য বড় ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে উচ্চমূল্যের কাগজি মুদ্রার ব্যবহারই সুবিধাজনক ; ছোটখাট লেনদেনের জন্য ধাতব মুদ্রা ব্যবহার করা হয়। আবার বড় ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে কাগজি মুদ্রা ব্যবহার করা হয়। ভারতে 50 পয়সার ও এক টাকা, দুই টাকা ও পাঁচ টাকার ধাতব মুদ্রা পাওয়া যায়। অন্যদিকে পাঁচ টাকা, দশ টাকা, কুড়ি টাকা, পঞ্চাশ টাকা, একশো টাকা, পাঁচশো টাকা ও হাজার টাকার কাগজি নোট দেখা যায়।

আবার, গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে অর্থকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—আইনসিদ্ধ অর্থ (legal tender money) এবং **ঐচ্ছিক অর্থ** (optional money)। **আইনসিদ্ধ অর্থ এমন অর্থ যার পিছনে আইনের সমর্থন রয়েছে।** এই ধরনের অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে সবাই বাধ্য। দেশের সরকার আইন বলে এই অর্থকে প্রচলন করেন এবং আইনের সমর্থন থাকার জন্যই সকলে এই অর্থ নিতে রাজি থাকেন। এই ধরনের অর্থ নিতে আপত্তি করলে তা হবে আইন বিরোধী কাজ। ভারতে সমস্ত ধাতব মুদ্রা এবং কাগজি নোটই আইনসিদ্ধ অর্থ। এই ধরনের ধাতব মুদ্রা এবং কাগজি নোট সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত। **ঐচ্ছিক অর্থের ক্ষেত্রে ঐ অর্থ গ্রহণ করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।** কোন ব্যক্তি ঐচ্ছিক অর্থ গ্রহণ করতে রাজি নাও হ'তে পারেন। এটা গ্রহণ করা বা না করা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ আমানত অর্থের কথা বলা যেতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছে চলতি আমানত হিসাবে যে টাকা রয়েছে সেই টাকার উপর চেক কেটে লেনদেন হ'তে পারে। সেজন্য চলতি আমানতকে অর্থের মধ্যে ধরা হয়। এই ধরনের আমানত অর্থ কিন্তু আইনসিদ্ধ অর্থ নয়। এটি ঐচ্ছিক অর্থ কারণ কোন ব্যক্তি চেকের মাধ্যমে পাওনা গ্রহণ করতে রাজি নাও হ'তে পারে।

➤ **আইনসিদ্ধ অর্থ আবার দুরকম হ'তে পারে ঃ অসীম আইনসিদ্ধ অর্থ** (Unlimited legal tender money) এবং **সসীম আইনসিদ্ধ অর্থ** (Limited legal tender money)। **অসীম আইনসিদ্ধ অর্থের সাহায্যে আইনত যে কোন পরিমাণ মূল্যের লেনদেন মেটানো সম্ভব। অন্যদিকে সসীম আইনসিদ্ধ অর্থের সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি দিলে লোকে তা গ্রহণ করতে অসম্মত হতে পারে।** ভারতে কাগজি নোটগুলি অসীম আইনসিদ্ধ অর্থ কিন্তু ধাতব মুদ্রার সবগুলি অসীম আইনসিদ্ধ অর্থ নয়। কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে 50 পয়সার মাধ্যমে কোন পরিমাণ অর্থ দিতে চায়, অপর ব্যক্তি ঐ মুদ্রার মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করতে রাজি নাও হতে পারে।

আর এক ধরনের শ্রেণিবিভাগ **করা হয় পদমর্যাদা বা নিদর্শনের ভিত্তিতে। নিদর্শনের ভিত্তিতে অর্থকে প্রামাণিক অর্থ** (Standard money) **এবং টোকেন অর্থ** (Token Money) **এই দুই ভাগে করা হয়। প্রামাণিক অর্থ সেই সমস্ত অর্থ যার দ্রব্যমূল্য বা অন্তর্নিহিত মূল্য** (commodity value or instrinsic value) এবং **অর্থ হিসাবে এর মূল্য পরস্পর সমান। অন্যদিকে টোকেন অর্থের ক্ষেত্রে এর অন্তর্নিহিত মূল্য বা দ্রব্য-মূল্য অর্থ হিসাবে এর মূল্য অপেক্ষা কম।**

কোন দ্রব্য যখন বিনিময়ের মাধ্যম বা অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন তার দুটি মূল্য আছে। যদি এটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত না হতো তাহলেও এর একটি মূল্য থাকতো। একেই বলা হচ্ছে অর্থের দ্রব্য-মূল্য বা অন্তর্নিহিত মূল্য। মনে করা যাক এক টাকার ধাতব মুদ্রা কখনও অর্থ হিসাবে বাতিল করা হ'ল। তখন এই ধাতব পদার্থটি গলিয়ে অন্য কাজে লাগান যাবে। এই ধাতব পদার্থটির তখন যা মূল্য হবে সেটিই এর দ্রব্যমূল্য বা অন্তর্নিহিত মূল্য। আর এই দ্রব্যটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এর যে মূল্য হয়েছে সেটাই এর অর্থ হিসাবে মূল্য। এখন যদি দ্রব্য হিসাবে মূল্য এবং অর্থ হিসাবে মূল্য পরস্পর সমান হয় তবে তাকে বলে প্রামাণিক অর্থ। যেমন এক সময় ছিল যখন ভারতে রূপোর ভরি ছিল এক টাকা এবং তখন এক টাকার মুদ্রায় এক ভরি রূপো থাকত। সেই সময়কার এক টাকার মুদ্রাকে প্রামাণিক অর্থ বলা যেতে পারে।

বর্তমানে প্রামাণিক অর্থ কোন দেশেই নেই। যে সমস্ত ধাতু মুদ্রা চালু আছে সেগুলির দ্রব্যমূল্য সেগুলির অর্থ হিসাবে মূল্য অপেক্ষা কম। কাজেই এগুলি টোকেন অর্থ। একটি 100 টাকার কাগজের নোটকে ধরা যাক। এটির অর্থ হিসাবে মূল্য 100 টাকা। কিন্তু যদি কখনও 100 টাকার নোট বাতিল হয় অর্থাৎ যদি এটি আর অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত না হয় তাহলে এটি এক টুকরো কাগজ হিসাবেই গণ্য হবে। এর দ্রব্য মূল্য হবে যৎসামান্য। কাজেই 100 টাকার নোটের দ্রব্য মূল্য এর অর্থ হিসাবে মূল্য অপেক্ষা কম। কাজেই 100 টাকার নোট একটি টোকেন অর্থ। তেমনি এক টাকার ধাতু মুদ্রায় যা ধাতু আছে তার দ্রব্য মূল্য এক টাকার চেয়ে কম। সেজন্য এক টাকার মুদ্রাও টোকেন অর্থ।

কোন ধাতব অর্থের দ্রব্য মূল্য ঐ দ্রব্যের অর্থ হিসাবে মূল্যের সমান বা কম হতে পারে কিন্তু বেশি হ'তে পারে না। তার কারণ এক টাকার মুদ্রায় যদি এক টাকার বেশি মূল্যের ধাতব পদার্থ থাকে, তাহলে ঐ মুদ্রাটি গলিয়ে ধাতু হিসাবে বিক্রি করা লাভজনক হয়ে উঠবে। সেজন্য অর্থের দ্রব্য মূল্য অর্থ হিসাবে মূল্যের চেয়ে বেশি হবে না। টোকেন অর্থের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ নাও থাকতে পারে। ব্যাঙ্কের আমানত এই ধরনের টোকেন অর্থ। এর অস্তিত্ব শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতাতেই সীমাবদ্ধ। এর কোন দ্রব্য-মূল্য নেই। এর যা মূল্য সেটা অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যই মূল্য।

তিনটি কারণে টোকেন অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে সব দেশেই। প্রথমত, ধাতুর দাম বেড়ে গেলে প্রামাণিক অর্থের দ্রব্যমূল্য অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়ে যায়। তখন লোকেরা ধাতু মুদ্রা গলিয়ে ধাতু হিসাবে বিক্রি করে। টোকেন অর্থে সেটি সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, ধাতুর স্বল্পতার জন্য অনেক সময় প্রামাণিক অর্থ বাজারে ছাড়া সম্ভব হয় না। কিন্তু টোকেন অর্থের এই অসুবিধা নেই। **তৃতীয়ত,** টোকেন অর্থের যোগান দ্রুত বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু প্রামাণিক অর্থের যোগান দ্রুত বাড়ানো সম্ভব নয়।

6.7 কাগজি মুদ্রা

(Paper Money or, Currency Notes)

বর্তমানে সব দেশেই কাগজি মুদ্রা বা কারেন্সি নোট প্রচলিত। এই কাগজি মুদ্রার কীভাবে উদ্ভব হ'ল সেটি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। একসময়ে মূল্যবান ধাতু হিসাবে সোনা এবং রূপো অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু এই ধাতব মুদ্রা ব্যবহার করার দুটি অসুবিধা দেখা দিল।

প্রথমত, এগুলি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হয়ে আসছিল। তার কারণ এই ধাতু দুটির চাহিদা যে হারে বাড়ছিল উৎপাদন সে হারে বাড়ছিল না। ফলে লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থের যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছিল না।

দ্বিতীয়ত, আর একটি অসুবিধা হ'ল যে অল্প পরিমাণ লেনদেনের জন্য ধাতব মুদ্রাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা সহজ ছিল না। তাছাড়া ধাতব মুদ্রা স্থানান্তরকরণেরও অসুবিধা ছিল। ইউরোপের বণিক সম্প্রদায়ের লোকেরা এইজন্য ধাতব মুদ্রা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে না নিয়ে গিয়ে এই ধাতব মুদ্রা বড় বড় শেঠ, মহাজন বা স্বর্ণকারদের কাছে জমা রাখত। বিনিময়ে তারা একটি রসিদ দিত। ঐ রসিদে আমানতকারীর স্বর্ণ বা রৌপ্য

জমার পরিমাণ লেখা থাকত। আমানতকারী প্রয়োজনে ঐ রসিদ দেখিয়ে স্বর্ণ বা রৌপ্য বাড়িতে এনে লেনদেনের উদ্দেশ্যে তা অন্য ব্যক্তিকে দিত। ক্রমে ক্রমে এই রসিদ বা সার্টিফিকেটগুলিই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এইভাবে মূল্যবান ধাতুর পরিবর্তে এক টুকরো কাগজ সমাজে লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব ছিল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সমস্ত দেশেই কাগজি মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের সহযোগিতায় কাগজি অর্থের প্রচলন করে। কাগজি অর্থ টোকেন অর্থ কারণ দ্রব্য হিসাবে এই অর্থের মূল্য খুবই কম এবং অর্থ হিসাবে এর মূল্য এর দ্রব্য মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। বর্তমানে সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে কাগজি অর্থ বাজারে ছেড়েছেন সেগুলি জনসাধারণের কাছে স্বীকৃত তার কারণ এগুলি আইনসম্মত অর্থ। সরকারের আদেশ বলে এই অর্থ প্রচলিত ব'লে একে **আদেশ বলে প্রচলিত অর্থ বা ফিয়াট অর্থ** (Fiat Money) বলা হয়। সরকারের আদেশানুসারেই এই কাগজি মুদ্রা প্রচলিত। তাই এই সমস্ত কাগজি মুদ্রা লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে সকলেই গ্রহণ করতে আইনত বাধ্য থাকে।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই কাগজি অর্থের প্রচলন হয়ে আসছে। মনে করা হয় যে, চিন দেশেই প্রথম কাগজি অর্থের প্রচলন হয়। ক্রমে ক্রমে কাগজি অর্থের ব্যবহার অন্য দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কাগজি অর্থের বহুল এবং ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। ভারতে কাগজি অর্থের ব্যবহার শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ভারতে ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল (Bank of Bengal) 1806 সালে প্রথম কাগজি অর্থের প্রচলন শুরু করে।

কাগজি অর্থকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। একটি রূপান্তরযোগ্য **কাগজি অর্থ** (Convertible Paper Money) এবং অপরটি **অরূপান্তরযোগ্য কাগজি অর্থ** (Inconvertible Paper Money)। রূপান্তরযোগ্য কাগজি অর্থের ক্ষেত্রে দেশে কাগজি নোট চালু তাকে ঠিকই তবে জনসাধারণ দাবি করলে দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কাগজি মুদ্রার পরিবর্তে সমমূল্যের সোনা বা রূপোর প্রামাণিক মুদ্রা পেতে পারে। অর্থাৎ রূপান্তরযোগ্য **কাগজি অর্থের ক্ষেত্রে কাগজি অর্থকে ইচ্ছামত প্রামাণিক মুদ্রা বা সোনা রূপোতে রূপান্তরিত করা যায়।** স্পষ্টতই এই ধরনের রূপান্তরযোগ্য কাগজি অর্থ ইস্যু করার সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সমপরিমাণ সোনা বা রূপো মজুত রাখতে হয়।

অরূপান্তরযোগ্য **কাগজি অর্থ সেই ধরনের কাগজি অর্থ যা প্রামাণিক মুদ্রায় বা অন্য কোন মূল্যবান ধাতুতে রূপান্তরিত করা যায় না।** কাগজি মুদ্রার পরিবর্তে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ধাতব মুদ্রা, সোনা বা রূপো দিতে বাধ্য না থাকে তাহলে এই ধরনের কাগজি অর্থকে অপরিবর্তনীয় কাগজি অর্থ বলা হয়। এইরূপ কাগজি অর্থের পিছনে আর্থিক কর্তৃপক্ষ সোনা, রূপো ইত্যাদি ধাতু মজুত রাখে না। ভারতে বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কাগজি অর্থ প্রচলন করে সেই অর্থ অরূপান্তরযোগ্য কাগজি অর্থ। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজি নোটের পরিবর্তে নোটের বাহককে স্বর্ণ বা রৌপ্য বা কোন মূল্যবান ধাতু দিতে বাধ্য নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে গচ্ছিত সোনা, রূপোর সঙ্গে কাগজি নোট প্রচলনের কোন আনুপাতিক সম্পর্ক নেই। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রেখে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যত খুশি নোট ছাপাতে পারে—এই রকম ক্ষমতা ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়েছে। যদিও ভারতীয় নোটগুলিতে একটি আশ্বাস লেখা থাকে "I promise to pay the bearer the sum of Rs....." ইত্যাদি, এটির কোন বাস্তবিক ভিত্তি নেই। এককালে অবশ্য ভারতে টাকার কাগজি নোটের বিনিময়ে সমমূল্যের সোনা বা রূপো পাওয়া যেত। তখন এই আশ্বাসের একটি ভিত্তি ছিল। সেই আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি হিসাবেই এই প্রতিশ্রুতিটি এখনও কাগজি অর্থের উপর লিপিবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং ভারতে বর্তমানে যে কাগজি নোটগুলি চালু রয়েছে সেই কাগজি নোটকে অরূপান্তরযোগ্য কাগজি অর্থ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

কাগজি অর্থের কতকগুলি সুবিধা এবং অসুবিধা আছে। এগুলি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। কাগজি অর্থের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ।

প্রথমত, কাগজি অর্থ ব্যবহার করার ফলে মূল্যবান ধাতুর ব্যবহার অল্প করা সম্ভব হয়। এই ধাতুকে অন্য কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, মূল্যবান ধাতুকে মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করলে ধাতুর যে ক্ষয় ক্ষতি হয় সেটি একটি বড় অপচয়। কাগজি মুদ্রা ব্যবহার করলে তারও ক্ষয় ক্ষতি হয় ঠিকই কিন্তু সেই অপচয় ধাতব মুদ্রার অপচয়ের থেকে কম কারণ কাগজের উৎপাদন ব্যয় ধাতুর উৎপাদন ব্যয়ের থেকে অনেক কম। **তৃতীয়ত,** যেহেতু কাগজ সহজেই উৎপাদন করা যায় এবং যেহেতু কাগজের উৎপাদন ব্যয় কম সেজন্য কাগজি অর্থের যোগান সহজে বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু ধাতব অর্থের যোগান সহজে বাড়ানো সম্ভব নয় কারণ ধাতব অর্থের যোগান ধাতুর যোগানের উপর নির্ভর করে।

চতুর্থত, জরুরী অবস্থায় কাগজি অর্থ ব্যবহার করা অধিক সুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ যুদ্ধের সময় যখন জরুরীকালীন ভিত্তিতে বিভিন্ন খরচ চালাতে হয় তখন যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। সেই অর্থ সহজেই কাগজি মুদ্রা ইস্যু করে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ধাতব মুদ্রার মাধ্যমে তা পাওয়া সম্ভব নয় কারণ ধাতব মুদ্রা ইস্যু করতে হলে ধাতুর যোগান থাকা দরকার। যুদ্ধের সময় ধাতুর যোগান কম থাকতে পারে। সেজন্য ধাতব মুদ্রা বাজারে ছাড়া সম্ভব নাও হতে পারে।

কাগজি মুদ্রার কিন্তু কয়েকটি অসুবিধা আছে। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ **প্রথমত,** কাগজি মুদ্রা প্রচলনের একটি প্রধান অসুবিধা এই যে এই ধরনের ব্যবস্থায় সহজেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। সোনা, রূপো ইত্যাদি কোন কিছুই মজুত না রেখে সরকার নোট ছাপিয়ে কাগজি অর্থের যোগান বাড়াতে পারে। এই অবস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাগজি নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়া হ'তে পারে। তাতে দেশের দামস্তর বৃদ্ধি পাবে। অর্থের মূল্য কমে আসবে। দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। যদি অতিরিক্ত নোট ছাপানোর ফলে জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়ে যায় তাহলে কাগজি মুদ্রাতে লোকেদের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। লোকেরা কাগজি মুদ্রা গ্রহণ করতে রাজি থাকে না। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর জার্মানিতে এইরূপ অবস্থাই দেখা দিয়েছিল। **দ্বিতীয়ত,** কাগজি মুদ্রা কোন একটি দেশের মধ্যেই চালু থাকে। এক দেশের কাগজি মুদ্রা অন্য দেশে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতের টাকা আমেরিকায় চলে না কিন্তু কাগজি মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ মুদ্রা বা রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হলে সেগুলি অন্য দেশেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কারণ সেই ধরনের মুদ্রার দ্রব্যমূল্য আছে। **তৃতীয়ত,** ধাতু মুদ্রা ব্যবহার করলে তা কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কাগজি অর্থ দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য আবার পুরানো নোটের পরিবর্তে নতুন নোট ছাপতে হয়। **চতুর্থত,** কাগজি মুদ্রার কোন দ্রব্যমূল্য বা অন্তর্নিহিত মূল্য নেই। এগুলিই টোকেন অর্থ এবং সরকারের আইন বলে প্রচলিত অর্থ (Fiat Money)। কখনও যদি সরকার কোন কাগজি নোট বাতিল বলে ঘোষণা করেন তখন সেই কাগজি নোটগুলি আর কোন কাজেই লাগবে না কারণ তাদের দ্রব্যমূল্য কিছু নেই।

যদিও কাগজি অর্থের সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়ই আছে কিন্তু মোটের উপর আমরা বলতে পারি যে অসুবিধার থেকে সুবিধাই বেশি। সেজন্য কাগজি মুদ্রা সকল দেশেই চালু আছে। কাগজি মুদ্রার যে অসুবিধাগুলি রয়েছে সেই অসুবিধাগুলির মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনাই সব থেকে বড় অসুবিধা। যদি দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকে এবং অতিরিক্ত কাগজি নোট ইস্যু না করে তাহলেই এই অসুবিধা দূরীভূত হবে।

6.8 আমানত অর্থ

(Deposit Money)

আমরা আগেই বলেছি যে ব্যাঙ্কের কাছে জনসাধারণের যে আমানত থাকে সেই আমানতের মাধ্যমে লেনদেন হয়ে থাকে। আমানত অর্থের উপর চেক কেটে সেই চেকের মাধ্যমে পাওনা মেটানো হয়। যদিও

আমানত অর্থ সকলে গ্রহণ করতে বাধ্য নয়, কিন্তু উন্নত অর্থনীতিতে অধিকাংশ লেনদেনই এই আমানতের মারফৎ হয়ে থাকে। উন্নত দেশগুলিতে আমানত অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাঙ্কগুলির কাছে জনসাধারণের যে আমানত থাকে সেই **আমানতগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।** **প্রথমত, একরকম আমানত হ'ল চলতি আমানত** (Current Account Deposits)। চাহিবা মাত্র এই টাকা তোলা যায় বলে একে চাহিদা আমানত (Demand Deposits) ও বলা হয়। এই ধরনের আমানতের উপর কোন সুদ পাওয়া যায় না এবং এগুলির উপর যখন খুশি চেক কেটে তোলা যায়। **দ্বিতীয়ত, মেয়াদি আমানত বা স্থায়ী আমানত** (Term Deposits or Fixed Deposits)। এই আমানতগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। সেই নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগে সাধারণতঃ এই টাকা তোলা যায় না। চেক কেটে এই আমানতের টাকা তোলা যায় না। এই আমানত থেকে সুদ পাওয়া যায়। এই স্থায়ী আমানতেরই আর একটি রকমফের **পৌনঃপুনিক আমানত** (Recurring Deposits)। এই আমানতের ক্ষেত্রে আমানতকারীকে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হয়। এই আমানতও নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তের আগে তোলা যায় না। **তৃতীয়ত, সঞ্চয় আমানত** (Savings Account Deposits) । এই আমানতে চলতি আমানতেরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আবার স্থায়ী আমানতেরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সঞ্চয় আমানতে কিছু সুদ পাওয়া যায় এবং সমস্ত টাকা যখন খুশি তোলা যায় না ; টাকা তোলার ব্যাপারে কিছু বিধি নিষেধ থাকে।

যে আমানতকে আমরা লেনদেনের কাজে ব্যবহার করতে পারব অর্থাৎ যে আমানতের উপর চেক কেটে পাওনাদারদের দাবি মেটানো যাবে সেই আমানতকেই আমরা আমানত অর্থ হিসাবে গণ্য করব। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে গেলে চলতি আমানত এবং সঞ্চয় আমানতের কিছুটা অংশকে আমাদের আমানত অর্থ হিসাবে গণ্য করা উচিত। মেয়াদি আমানতকে অর্থ হিসাবে গণ্য করা যায় না কারণ মেয়াদি আমানতের উপর চেক কাটা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানও জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। কিন্তু সেই অব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থার আমানতকে অর্থের যোগানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না তার কারণ এগুলিকে প্রয়োজনমতো চেক কেটে তোলা যায় না। এগুলি সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহৃত হয় ; বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যা ব্যবহৃত হয় তাকেই আমরা অর্থ বলছি। এই যুক্তিতে ব্যাঙ্ক নয় এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতকে আমরা অর্থের যোগানের অন্তর্ভুক্ত করি না।

6.8 বিভিন্ন প্রকারের চেক
(Different Types of Cheques)

আমরা জানি যে ব্যাঙ্কের কাছে চলতি আমানতে যে টাকা থাকে সেই টাকা চেকের মাধ্যমে তোলা যায়। কোন কোন সঞ্চয় আমানতের ক্ষেত্রেও চেকের মাধ্যমে টাকা তোলার সুবিধা আছে। এই চেক কাকে বলে এবং চেক কয় প্রকারের আছে তা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। যখন কোন ব্যক্তি কোন ব্যাঙ্কে চলতি আমানতে টাকা জমা রাখে তখন ব্যাঙ্ক ঐ আমানতকারীকে একটি চেক বই দেয়। চেকের সুবিধাযুক্ত সঞ্চয় আমানত খোলার সময়ও আমানতকারীকে ঐরূপ একটি চেকবই দেওয়া হয়। আমানতকারী যখন তার আমানত থেকে অর্থ তুলতে চাইবে বা যখন ঐ আমানতের মাধ্যমে লেনদেন করতে চাইবে তখন ঐ চেক বই থেকে একটি চেক নিয়ে সেটি যথাযথ পূরণ করে ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। **কাজেই চেক হল নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত একটি লিখিত আদেশ।** (A cheque is an order on a bank to pay money)। আমানতকারীর আমানতে অর্থ থাকলে এবং ব্যাঙ্কে রক্ষিত নমুনা স্বাক্ষরের সঙ্গে চেকের উপর লিখিত আমানতকারীর স্বাক্ষরের মিল হলে ব্যাঙ্ক আমানতকারীর আদেশ মত অর্থ দিয়ে থাকে।

চেকে সাধারণত **তিনটি পক্ষ** জড়িত থাকে। **প্রথমত,** চেক মারফত একজন আমানতকারী ব্যাঙ্ককে আদেশ দেয়। এই আমানতকারীকে বলা হয় **চেকের ড্রয়ার** (Drawer of the cheque)। চেকে ড্রয়ারের সই থাকে এবং এই সইয়ের সঙ্গে ব্যাঙ্কে রক্ষিত নমুনা সই মিলতে হবে। **দ্বিতীয়ত,** চেকটির মারফত কোন ব্যাঙ্ককে আদেশ দেওয়া হচ্ছে। ঐ ব্যাঙ্ককে বলে **চেকের ড্রয়ী** (Drawee of the cheque)। ড্রয়ী ব্যাঙ্কই চেক বই আমানতকারীকে সরবরাহ করে এবং এই ড্রয়ী ব্যাঙ্কের নাম চেক বইয়ের প্রতি পাতায় লিপিবদ্ধ থাকে। **তৃতীয়ত,** চেকের মাধ্যমে আমানতকারী নিজেকে টাকা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিতে পারে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে টাকা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিতে পারে। **যে ব্যক্তিকে টাকা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তাকে চেকের গ্রহীতা** (Payee of the cheque) **বলা হয়।** নিজেকে টাকা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলে pay to self এই কথা চেকে লিখতে হয়। আর অন্য কোন ব্যক্তিকে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিলে pay to এর পর সেই ব্যক্তির নাম চেকে লিখতে হয়। Pay to self লিখিত চেকের ক্ষেত্রে চেকের ড্রয়ার ও চেকের গ্রহীতা একই ব্যক্তি। কিন্তু অন্য ব্যক্তিকে টাকা দেওয়ার আদেশ হলে চেকের ড্রয়ার এবং চেকের গ্রহীতা ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে থাকে।

➤ আমানতকারী **ব্যাঙ্ককে চেক মারফত যে আদেশ দিচ্ছে সেই আদেশের প্রকৃতি অনুযায়ী চেককে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ বাহক চেক** (Bearer cheque), **আদেশ চেক** (Order cheque) এবং **রেখা চিহ্নিত চেক** (Crossed cheque)। বাহক চেক এবং আদেশ চেককে একত্রে খোলা চেক বা Open Cheque বলা হয় কারণ এই দু'ধরনের চেকের অর্থ সরাসরি ব্যাঙ্কের কাউন্টার থেকে পাওয়া যায়। এই তিন প্রকার চেকের বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে বর্ণনা করা হ'ল।

◎ **বাহক চেক ঃ** এই ধরনের চেকে চেক গ্রহীতার নামের পর or bearer এই কথাটি লেখা থাকে। এই ধরনের চেক হস্তান্তরযোগ্য। যার হাতে এই চেকটি থাকবে সেই ব্যক্তিই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পেতে পারবে। চেক গ্রহীতা যদি এই চেক হারিয়ে ফেলে এবং যে চেক পেল সে যদি ব্যাঙ্ক থেকে এই অর্থ তুলে নেয় তাহলে ব্যাঙ্ক দায়ী নয়। বাহক চেক যে ব্যক্তি ব্যাঙ্কের কাছে পেশ করবে ব্যাঙ্ক তাকেই টাকা দেবে। কাজেই বাহক চেক নগদ টাকার মতই মূল্যবান।

◎ **আদেশ চেক ঃ** এই ধরনের চেকের ক্ষেত্রে চেক গ্রহীতার নামের পর or order কথাটি লেখা থাকে। এক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্যাঙ্ক টাকা দেবে অন্য ব্যক্তিকে নয়। চেক গ্রহীতাকে ব্যাঙ্কের কাছে নিজের সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে। আদেশ চেক অনুমোদনসাপেক্ষে হস্তান্তরযোগ্য। এই ধরনের চেকের নিরাপত্তা বাহক চেকের তুলনায় বেশি।

◎ **রেখা চিহ্নিত চেক ঃ** বাহক চেক বা আদেশ চেককে রেখা চিহ্নিত চেকে রূপান্তরিত করা যায়। যে চেকের উপর বাঁদিকে কোণে দুটি সমান্তরাল সরলরেখা টেনে লাইনদুটির মধ্যে Account payee বা, & Co বা, Not negotiable কথা দুটি লেখা থাকে সেই চেককে বলে রেখা চিহ্নিত চেক। এই ধরনের চেকের অর্থ সরাসরি ব্যাঙ্কের, কাউন্টার থেকে পাওয়া যায় না। চেকের গ্রহীতাকে এই চেককে কোন একটি ব্যাঙ্কে, যেখানে তার নামে আমানত আছে সেখানে, জমা দিতে হবে। ঐ চেকের টাকা এর পর ড্রয়ী ব্যাঙ্কে চেকের ড্রয়ারের আমানত থেকে বাদ যাবে এবং চেক গ্রহীতার ব্যাঙ্কে তার আমানতের সঙ্গে যোগ হবে। এই কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পরই চেক গ্রহীতা তার আমানত থেকে ঐ টাকা তুলতে পারবে। এই ধরনের চেক খুব নিরাপদ কারণ এই ধরনের চেক কোন ব্যাঙ্কের আমানতের মাধ্যমে ভাঙাতে হবে। কাজেই চেকের অর্থ কোন্ ব্যক্তির হিসাবে জমা পড়ছে এবং কোন্ ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে তার রেকর্ড রয়ে যাচ্ছে।

◎ **চেক কি অর্থ ? ঃ** অনেকে মনে করেন চেকই অর্থ। কিন্তু এই ধারণা ভুল। **চেক কখনই অর্থ নয়।** ব্যাঙ্কের কাছে যে আমানত রয়েছে যা চেকের মাধ্যমে তোলা যায় বা চেকের মাধ্যমে হস্তান্তরিত করা যায় সেই আমানতটাই অর্থ। চেক সেই আমানত তোলার জন্য বা হস্তান্তরিত করার জন্য একটি আদেশ মাত্র। কাজেই আমানত হচ্ছে অর্থ ; চেক অর্থ নয়। আমানতে যদি টাকা না থাকে তাহলে চেক মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া অর্থের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা থাকে। চেকের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নেই। চেক দাতার উপর

চেক গ্রহীতার বিশ্বাস না থাকলে চেকের মাধ্যমে লেনদেন হতে পারে না। তাছাড়া আমানত অর্থ আইনসিদ্ধ অর্থ নয়। সেজন্য আইনত চেক গ্রহণ করতে সকলে বাধ্য নয়।

চেক অর্থ না হলেও চেকের ব্যবহার লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করে। দেশ যত উন্নত হয় তত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। আমানত অর্থের গুরুত্ব তত বৃদ্ধি পায়। আমানত অর্থের পরিমাণ যত বাড়ে লেনদেনে চেকের ব্যবহার তত বৃদ্ধি পায়। চেক ব্যবহারের ফলে নগদ অর্থের ব্যবহার কম হয়। একটি চেকের মাধ্যমে হাজার হাজার টাকার লেনদেন হতে পারে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নগদ অর্থ পাঠানোর ঝুঁকি আছে কিন্তু রেখাচিহ্নিত চেকের মাধ্যমে নিরাপদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ পাঠানো যায়।

6.10. অর্থ ব্যবহারের সুফল ও কুফল
(Advantages and Disadvantages of the use of Money)

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যানবাহনের ইতিহাসে চাকার আবিষ্কার যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেইরকম কোন দেশের অর্থ ব্যবস্থায় অর্থের আবিষ্কারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বর্তমানকালে কোন দেশের অর্থনীতিতে যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু হল অর্থ। আধুনিক অর্থনীতি একান্তভাবেই অর্থের উপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় অর্থই কেন্দ্রবিন্দু যাকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। **অর্থ ব্যবহারের কতকগুলি সুবিধা** আমরা উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, অর্থের প্রচলনের ফলে মানুষকে আর দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হতে হয় না। মানুষকে এখন বিনিময় করার জন্য তার আকাঙ্ক্ষিত প্রতিপক্ষের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। মানুষ তার নিজের দ্রব্য বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে এবং পরে ঐ সংগৃহীত অর্থ দ্বারা নিজ আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যটি প্রয়োজনমত ক্রয় করে। দ্বিতীয়ত, অর্থ ব্যবহার করার ফলে ভোগকারী ক্রেতাদেরও বিশেষ উপকার হয়েছে। অর্থের মধ্যে ক্রয় ক্ষমতা নিহিত থাকে। সেই ক্রয় ক্ষমতা ক্রেতারা নিজেদের সুবিধা ও ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। অর্থ পাওয়ার সাথে সাথেই তা ব্যয় করার কোন প্রয়োজন নেই। কাজেই ভোগকারী সাময়িকভাবে তার ক্রয় ক্ষমতাকে স্থগিত রাখতে পারে। **তৃতীয়ত, উৎপাদকদের কাছেও অর্থের ব্যবহার সুবিধাজনক।** কাঁচামাল কেনা, ঋণ মূলধন সংগ্রহ, শ্রমিককে মজুরি দেওয়া—এগুলি অর্থের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান অর্থের সাহায্যে কেনা যায়। এইভাবে উৎপাদনের কাজটি সংগঠন করা অর্থের ব্যবহারের ফলে সহজসাধ্য হয়েছে। **চতুর্থত, অর্থ ব্যবহার করার ফলে শ্রম বিভাগ এবং বিশেষায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।** এর ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ ব্যবহার করার ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। **পঞ্চমত, অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য।** সমাজে বিভিন্ন মানের অর্থ প্রচলিত থাকে। **তাই ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন মূল্যের দ্রব্য অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতে পারে।** দ্রব্যের অবিভাজ্যতার জন্য দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় যে সমস্যার উদ্ভব হতো সেই সমস্যাকে অর্থের মাধ্যমে এড়ানো সম্ভব। **ষষ্ঠত, অর্থ ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যৎ লেনদেনও সম্ভবপর হয়েছে।** ভবিষ্যৎ লেনদেনে দাম সম্পর্কে বর্তমানে চুক্তি হয় এবং ঐ চুক্তি অনুযায়ী ভবিষ্যতে দাম দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে মূল্যের পরিমাপক হিসাবে অর্থ ব্যবহার করা হয়। কাজেই অর্থের মাধ্যমে ভবিষ্যতের লেনদেন সম্ভবপর হয়। **সপ্তমত, সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থ কাজ করে।** দ্রব্যের মাধ্যমে সঞ্চয় করা সকল সময়ে সম্ভব নয় কারণ অনেক দ্রব্য সামগ্রী পচনশীল ; কিন্তু অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করা যেতে পারে। এই সঞ্চয় আবার মূলধন গঠনেও সাহায্য করে। মূলধন গঠনকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে মনে করা হয়। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থের প্রচলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **অষ্টমত,** আধুনিক অর্থনীতিতে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সরকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর আদায় করেন ; আবার সরকার নানাবিধ কাজকর্মের জন্য ব্যয়ও করে থাকেন। **অর্থের মাধ্যমেই সরকারের এই আয় ব্যয় হয়ে থাকে।**

অর্থের ব্যবহার ছাড়া সরকারের পক্ষে কাজকর্ম পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। সরকারি আয় ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থের অবদান কম নয়। **নবমত,** অর্থের মাধ্যমে সম্পদের কোন অংশ ধরে রাখলে সম্পদের ঐ অংশটি মূল্যের ওঠানামা জনিত সমস্যা থেকে মুক্তি পায়। সম্পদ যদি জমি, বাড়ি, শেয়ার, বন্ড এই সমস্ত আকারে রাখা হয় তাহলে সেই সম্পদের মূল্য ওঠানামা করতে পারে কিন্তু এদের পরিবর্তে যদি সম্পদকে টাকার মাধ্যমে রাখা যায় তাহলে মূল্যবৃদ্ধির এই অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। **দশমত,** অনেক সময় হঠাৎ খরচ করার প্রয়োজন আসে। এসব ক্ষেত্রে হাতে কিছু টাকা থাকলে অসুবিধায় পড়তে হয় না। কিন্তু অন্যান্য সম্পদ হাতে থাকলে তা দিয়ে খরচ মেটানো যায় না। অন্যান্য সম্পদকে প্রথমে অর্থে রূপান্তরিত করে তবেই তা ব্যয় করা যেতে পারে। অর্থের এটিও একটি প্রধান সুবিধা।

কিন্তু এই সমস্ত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও **অর্থ ব্যবহারের কিছু কিছু অসুবিধাও আছে।** সেই অসুবিধাগুলি এখন আমরা আলোচনা করব।

প্রথমত, অর্থের প্রচলনের ফলে দেশে বাণিজ্য চক্র সৃষ্টি হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক কাজকর্মে একটা ওঠানামা চলতে থাকে। বেশ কিছুদিন আয়, কর্মসংস্থান, দামস্তর এইসব বাড়ে। তাকে বাণিজ্য চক্রের উর্ধ্বগতি বলে। তারপর, আবার এগুলি কমতে থাকে। তাকে বাণিজ্য চক্রের নিম্নগতি বলে। এইভাবে ওঠা নামার মধ্য নিয়ে অর্থনীতি অগ্রসর হতে থাকে। অনেকে মনে করেন যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এই যে বাণিজ্য চক্রের আবির্ভাব এটি অর্থের প্রচলনের সাথেই জড়িত।

দ্বিতীয়ত, অর্থের আর একটি প্রধান ত্রুটি এই যে **এর মূল্য বছর বছর স্থিতিশীল থাকে না।** অর্থের মূল্য বলতে আমরা অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকেই বুঝি। অর্থের মূল্য অন্যান্য দ্রব্যের দাম স্তরের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য দ্রব্যের দাম স্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমে এবং অন্যান্য দ্রব্যের দাম স্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে। দাম স্তরের ওঠানামার সাথে সাথে অর্থের মূল্যের ওঠা নামা হয়ে থাকে। অর্থের মূল্যের ওঠা নামার জন্য অর্থের মাধ্যমে যে সমস্ত বিষয় পরিমাপ করা হয় সেই পরিমাপগুলি সঠিক হয় না। এই কারণেই কোন দেশের আর্থিক জাতীয় আয় সেই দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঠিক মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয় না।

তৃতীয়ত, অর্থ আবিষ্কারের ফলে ঋণ দেওয়া নেওয়া সহজ হয়েছে। তার ফলে ঋণ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঋণ মূলধনের সাহায্যে বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা তাদের উদ্যোগকে বাড়িয়ে ফেলতে পারছে। এর ফলে **ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসার ঘটছে এবং ধনী ব্যক্তিরা আরও ধনী হয়ে উঠছে।** আয় ও সম্পদের নিদারুণ বৈষম্য দেখা দিচ্ছে।

চতুর্থত, অর্থের যোগান যদি সীমিত রাখা সম্ভব হয় তবেই তা অর্থ ব্যবস্থার দিক থেকে মঙ্গলকর। কিন্তু যদি অর্থের যোগান দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে তাহলে দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেবে। এই জন্যই বলা হয় যে যদি অর্থকে মানুষের ভৃত্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় অর্থাৎ যদি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায় তাহলে অর্থ একটি ভাল ভৃত্যের কাজ করে। কিন্তু যদি অর্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং অর্থকে প্রভু করে তোলা হয় তাহলে অর্থ কিন্তু ক্ষতিকারক প্রভু হিসাবে দেখা দেয়। এজন্যই ইংরাজিতে একটি কথা আছে—"Money is a good servant but a bad master.".

পঞ্চমত, অর্থনৈতিক কুফল ছাড়াও **অর্থ ব্যবহারের কতকগুলি সামাজিক কুফলও আছে।** অর্থের প্রচলন মানুষকে শান্তি ও সরলতার পথ থেকে সরিয়ে এনেছে। অর্থের প্রচলন মানুষকে করে তুলেছে লোভী। মানুষের মনে প্রচুর পরিমাণে অর্থের মালিকানা অর্জনের ইচ্ছার সৃষ্টি করেছে। এজন্য মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নিতেও পিছপা হয় না। অতিরিক্ত অর্থ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে অপরকে শোষণ করার জন্য ধাবিত করেছে। তাছাড়া বস্তুবাদী সমাজে সবকিছুই পরিমাপ করা হয় অর্থের মাধ্যমে। অর্থের প্রাচুর্য বা স্বল্পতা দিয়ে ব্যক্তির কৌলিন্য স্থির হয়। সমাজের সকল রকম অনিষ্টকর প্রভাবের মূলে রয়েছে অর্থ ও তার জন্য আকাঙ্ক্ষা। এই জন্যই বলা হয় অর্থই অনর্থের মূল। অর্থ ব্যবহারের মাত্রাতিরিক্ত ইচ্ছার ফলেই মানুষের নানাবিধ নৈতিক অধঃপতন ঘটে।

এই সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও কিন্তু আমরা অর্থের প্রচলন বাদ দিয়ে পুরানো ধরনের দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারি না । কারণ দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধার তুলনায় অর্থের ব্যবহারের সুবিধা অনেক বেশি। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা অর্থ ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না। শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক সমাজই নয় সমাজতান্ত্রিক সমাজেও অর্থের প্রয়োজন আছে। অর্থের অনিষ্টকর প্রভাব কিছু আছে ঠিকই কিন্তু সে তুলনায় অর্থের সুফল অনেক বেশি। কাজেই বর্তমান অর্থনীতিতে অর্থের ব্যবহার তুলে দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

6.11. গ্রেসামের সূত্র
(Gresham's Law)

ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ মুদ্রা ব্যবস্থার সংশোধন করার চেষ্টা করেন। সেই সময়ে ইংল্যান্ডে অনেক নিকৃষ্টমানের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। রাণী এলিজাবেথ মুদ্রা ব্যবস্থার সংশোধন করে উৎকৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন করেন এবং সেগুলি বাজারে ছাড়েন। কিন্তু রাণী এলিজাবেথ দেখলেন যে উৎকৃষ্ট মুদ্রা বাজারে চালু করলেও সেগুলি বাজার থেকে দ্রুত অন্তর্হিত হচ্ছে এবং নিকৃষ্ট মুদ্রাগুলিই বাজারে চালু থাকছে। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য রাণী এলিজাবেথ স্যার টমাস গ্রেসামকে আদেশ দেন। গ্রেসাম অনুসন্ধান করে এর যে ব্যাখ্যা দেন তাই **গ্রেসামের সূত্র** (Gresham's law) নামে পরিচিত। গ্রেসামের সূত্রটিকে এইভাবে বিবৃত করা যেতে পারে ঃ **যখন উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং নিকৃষ্ট মুদ্রা উভয়ই আইনসঙ্গত মুদ্রা হিসেবে দেশে চালু রয়েছে তখন নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজার থেকে অপসারিত করে।** (Bad money tends to drive good money out of circulation when both are full legal tender.)

গ্রেসামের সূত্রটি ব্যাখ্যা করার আগে উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং নিকৃষ্ট মুদ্রা বলতে কী বোঝায় সেটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যদি দেশে শুধুমাত্র কাগজি মুদ্রা প্রচলিত থাকে তাহলে নতুন নোটগুলিকে উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং ময়লা পুরানো নোটগুলিকে নিকৃষ্ট মুদ্রা বলা যেতে পারে। আবার দেশে যদি দুটি ধাতু নির্মিত মুদ্রা প্রচলিত থাকে তখন ঐ দুটি ধাতুর বাজার দামের তারতম্য অনুযায়ী একটি মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং একটি মুদ্রা নিকৃষ্ট মুদ্রা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক স্বর্ণ নির্মিত মুদ্রা এবং রৌপ্য নির্মিত মুদ্রা চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বর্ণ নির্মিত মুদ্রাকে উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং রৌপ্য নির্মিত মুদ্রাকে নিকৃষ্ট মুদ্রা বলা হয় কারণ স্বর্ণের বাজার দাম রৌপ্যের বাজার দাম অপেক্ষা বেশি। অর্থাৎ ধাতব মূল্যের দিক থেকে যে মুদ্রা অপর মুদ্রা অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাকেই আমরা নিকৃষ্ট মুদ্রা বলতে পারি। আবার যদি দেশে এক ধাতুরই মুদ্রা চালু থাকে, তাহলে ঐ ধাতু নির্মিত নতুন মুদ্রাকে উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং ঘষা, ক্ষয়প্রাপ্ত পুরানো মুদ্রাকে নিকৃষ্ট মুদ্রা বলা হয়। আবার যখন দেশে ধাতু মুদ্রা এবং কাগজি মুদ্রা উভয়ই চালু থাকে তখন কাগজি মুদ্রাকে নিকৃষ্ট মুদ্রা এবং ধাতু মুদ্রাকে উৎকৃষ্ট মুদ্রা বলা হয়। ধাতু মুদ্রার অন্তর্নিহিত মূল্য (Intrinsic value) আছে। কিন্তু কাগজি মুদ্রার কোন অন্তর্নিহিত মূল্য নেই। সেজন্য ধাতু হিসাবে ধাতু মুদ্রার মূল্য কাগজি মুদ্রার মূল্য অপেক্ষা বেশি। তাই ধাতু মুদ্রাকে উৎকৃষ্ট মুদ্রা ও কাগজি মুদ্রাকে নিকৃষ্ট মুদ্রা বলা হয়।

তিনটি কারণে গ্রেসামের সূত্রটি কার্যকর হয়। প্রথমত, লোকেরা উৎকৃষ্ট মুদ্রা জমাতে চায়। মানুষের স্বভাবই এই যে, নতুন এবং পুরানো মুদ্রা হাতে থাকলে লোকে পুরানো মুদ্রাটি আগে খরচ করতে চায় এবং নতুন মুদ্রাটি জমিয়ে রাখতে চায়। এইভাবে নতুন মুদ্রাগুলি বাজারে বেশি চলে না, পুরানো মুদ্রাগুলিই বেশি হাতবদল হয়ে থাকে। **দ্বিতীয়ত,** যখন ধাতব মুদ্রা দেশে চালু রয়েছে তখন ঐ ধাতব মুদ্রাগুলিকে অনেক সময়ে গলিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়। সোনা, রূপো প্রভৃতি ধাতু যে শুধু মুদ্রা হিসাবেই ব্যবহৃত হয় তা নয়। এগুলি শিল্পের কাজেও ব্যবহৃত হয়। যেমন সোনা বা রূপোর মুদ্রা গলিয়ে যে ধাতু পাওয়া যায় তার দ্বারা অলঙ্কার প্রস্তুত করা যেতে পারে। পুরানো মুদ্রা অপেক্ষা নতুন মুদ্রায় অধিক পরিমাণে ধাতু থাকে বলে ব্যবসায়ীরা এই ধরনের মুদ্রাই প্রথমে গলাতে চায়। **তৃতীয়ত,** বিদেশে পাঠানোর জন্য অনেক সময়ে উৎকৃষ্ট মুদ্রা ব্যবহার করতে হয়। ধরা যাক দেশে স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা চালু আছে। বৈদেশিক লেনদেনের সময়ে ধরা যাক বিদেশীরা রৌপ্য মুদ্রা গ্রহণ করতে রাজি নয় কিন্তু স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করতে রাজি আছে। সেক্ষেত্রে

বৈদেশিক পাওনা মেটানোর জন্য দেশকে স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে। তার ফলে দেশের অভ্যন্তরে লেনদেনের জন্য বেশি পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাবে না। লেনদেনের জন্য রৌপ্য মুদ্রাগুলিই ব্যবহৃত হবে। এযক্ষেত্রে স্বর্ণ মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা নিকৃষ্ট মুদ্রা। উৎকৃষ্ট মুদ্রা বৈদেশিক লেনদেনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য নিকৃষ্ট মুদ্রাই বাজারে চালু রয়েছে।

দুটি অবস্থায় গ্রেসামের সূত্র কার্যকর হয় না। প্রথমত, যদি দেশের মুদ্রার মোট প্রচলন দেশের মোট প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয়, তাহলে এই নিয়ম কার্যকর হবে না। ধরা যাক কোন ব্যক্তির নিকট উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট মুদ্রায় মোট 500 টাকা আছে। ঐ ব্যক্তিকে যদি 500 টাকাই খরচ করতে হয় তাহলে তার পক্ষে উৎকৃষ্ট মুদ্রা সঞ্চয় করা এবং নিকৃষ্ট মুদ্রা ব্যয় করা সম্ভব হবে না। সমস্ত মুদ্রাই তাকে ব্যয় করতে হবে। সুতরাং উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ যদি প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয় তখন এই নিয়ম কার্যকর হবে না। **দ্বিতীয়ত,** যদি নিকৃষ্ট মুদ্রা এত নিকৃষ্ট হয় যে জনসাধারণ এটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলেও এই নিয়ম কার্যকর হবে না। উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক দেশে শুধুমাত্র কাগজি নোটই চালু আছে। এখন যদি শুধুমাত্র কাগজি নোটই প্রচলিত থাকে তাহলে আমরা নতুন চকচকে নোটগুলিকে উৎকৃষ্ট মুদ্রা এবং পুরানো ময়লা নোটগুলিকে নিকৃষ্ট মুদ্রা বলে থাকি। এখন পুরানো নোটগুলি যদি এত নিকৃষ্ট হয় যে সেগুলি জনসাধারণ নিতে অস্বীকার করে, তাহলে নতুন নোটই খরচ করতে হবে। এক্ষেত্রেও উৎকৃষ্ট মুদ্রাই বাজারে প্রচলিত থাকবে এবং গ্রেসামের সূত্রটি কার্যকর হবে না।

6.12. মুদ্রা ব্যবস্থা (Monetary System)

কোন দেশে যে সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী অর্থ প্রচলিত হয় এবং অর্থের মূল্য নির্ধারিত হয় সেই নিয়মগুলিকে একত্রে ঐ দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা (Monetary System) **বলা হয়।** তিন ধরনের মুদ্রা ব্যবস্থা দেখা যায় ঃ (i) **একধাতুমান ব্যবস্থা** (Mono-metalism), (ii) **দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা** (Bi-metalism) এবং (iii) **কাগজি মুদ্রা ব্যবস্থা** (Managed paper standard)। এই তিনটি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

◎ **একধাতুমান ব্যবস্থা ঃ** একধাতুমান ব্যবস্থায় দেশের বিহিত মুদ্রার দাম একটি ধাতুর দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়। **এই ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে একটি ধাতু নির্মিত মুদ্রাই প্রচলিত থাকে ।** যদি স্বর্ণ নির্মিত মুদ্রা দেশে প্রচলিত থাকে তাহলে একে স্বর্ণমান (Gold Standard) বলা হয়। আবার যদি দেশে রৌপ্য নির্মিত ধাতু মুদ্রাই প্রচলিত থাকে তাহলে একে রৌপ্যমান বলা হয়। 1835 থেকে 1894 সাল পর্যন্ত ভারতে রৌপ্য মান (Silver Standard) প্রচলিত চিল। আবার ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 1914 সাল পর্যন্ত স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল।

◎ **দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা ঃ দ্বিধাতুমান ব্যবস্থায় দেশে দুটি ধাতুনির্মিত মুদ্রা প্রচলিত থাকে** এবং দেশের প্রচলিত মুদ্রার মূল্য উভয় ধাতুর মূল্যের উপরই নির্ভর করে। সাধারণত স্বর্ণমুদ্রা এবং রৌপ্যমুদ্রা আইনসিদ্ধভাবে পাশাপাশি প্রচলিত থাকে। উভয় প্রকার মুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রারূপে স্বীকৃত হয় এবং এই দুই প্রকার মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট থাকে। জনসাধারণ টাঁকশালে স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা দিলে তার বিনিময়ে টাঁকশাল থেকে স্বর্ণমুদ্রা অথবা রৌপ্যমুদ্রা পেতে পারে। 1803 সালে ফ্রান্স এই দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অর্থ সংক্রান্ত গ্রেসামের নিয়ম কার্যকর হওয়ায় দ্বিধাতুমানের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বর্ণমুদ্রা এবং রৌপ্যমুদ্রা একসঙ্গে চালু থাকলে বাজারে রৌপ্যমুদ্রাগুলিই হাত বদল হয়। স্বর্ণমুদ্রা বাজার থেকে উধাও হয়। সেইজন্য দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয় যে যেহেতু দুটি ধাতুর মুদ্রা থাকে সেজন্য মুদ্রার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করা সহজ হয়। তাছাড়া মুদ্রা প্রচলনের জন্য দুরকম ধাতুতে রিজার্ভ রাখা যায় বলে, অধিক রিজার্ভ রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু এর প্রধান অসুবিধা এই যে দুটি ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত থাকলে এদের মধ্যে নির্দিষ্ট বিনিময় হার রক্ষা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে

যখন কাগজি মুদ্রা প্রচলিত হল তখন ধাতব মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশেই হ্রাস পায় এবং এই জন্যই দ্বিধাতুমান সকল দেশেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

◎ **কাগজি মুদ্রা ব্যবস্থা ঃ** বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই ধাতব মুদ্রা মানের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত কাগজি মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী দেশের মুদ্রা কাগজি নোটে ছাপানো হয় এবং এই মুদ্রা স্বর্ণে বা রৌপ্যে রূপান্তরযোগ্য নয়। একটি নির্দিষ্ট নীতি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের সরকার বা আর্থিক কর্তৃপক্ষ কাগজি নোট ইস্যু করে এবং ঐ বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমেই কাগজি মুদ্রার মোট পরিমাণ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কাগাজ মুদ্রার সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি বিশদভাবে আগেই আলোচনা করা হয়েছে [6.7 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

6.13 স্বর্ণমান ব্যবস্থা
(Gold Standard)

কোন দেশের বিহিত মুদ্রার মূল্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনার সঙ্গে যুক্ত করা থাকলে তাকে স্বর্ণমান ব্যবস্থা বলা হয়। স্বর্ণমান ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। **প্রথমত,** কোন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকলে দেশে হয় স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকে অথবা কাগজি মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও কাগজি মুদ্রাকে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যায়। **দ্বিতীয়ত,** স্বর্ণমান ব্যবস্থায় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটি নির্দিষ্ট দামে স্বর্ণ অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করে বা আমদানি-রপ্তানি করে। **তৃতীয়ত,** দেশের মুদ্রার মূল্য স্বর্ণের মাধ্যমে বা স্বর্ণের মূল্য দেশের মুদ্রার মাধ্যমে স্থির রাখা হয়। **চতুর্থত,** দেশের স্বর্ণের যোগানের সঙ্গে অর্থের যোগানের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। দেশে স্বর্ণের যোগান বাড়লে অর্থের যোগান বাড়ে এবং স্বর্ণের যোগান কমলে অর্থের যোগান কমে।

➤ **চার ধরনের স্বর্ণমান ব্যবস্থা দেখা যায় ঃ** (i) **বিশুদ্ধ স্বর্ণমান** (Pure Gold Standard), (ii) **স্বর্ণ পিণ্ডমান** (Gold Bullion Standard), (iii) **স্বর্ণ বিনিময় মান** (Gold Exchange Standard), (iv) **স্বর্ণ মজুত মান** (Gold Reserve Standard)। **এই চার ধরনের স্বর্ণমানের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।**

◎ **বিশুদ্ধ স্বর্ণমান ঃ** বিশুদ্ধ স্বর্ণমানের তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। **প্রথমত,** এই ধরনের স্বর্ণমান ব্যবস্থায় সোনার তৈরি মুদ্রা দেশে প্রচলিত থাকে। **দ্বিতীয়ত,** এই ধরনের ব্যবস্থায় যে কোন ব্যক্তি স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ পেতে পারে। অর্থাৎ জনসাধারণ সোনা নিয়ে টাঁকশালে গেলে সরকার বিনা খরচে স্বর্ণ নির্মিত ধাতু মুদ্রা জনসাধারণকে যোগান দেবে। **তৃতীয়ত,** আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অবাধে সোনা আমদানি এবং রপ্তানি করা যাবে। সোনা আমদানি বা রপ্তানির উপর কোন বাধানিষেধ থাকে না।

◎ **স্বর্ণ পিণ্ডমান ঃ** স্বর্ণ পিণ্ডমান ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ **প্রথমত,** এই ধরনের ব্যবস্থায় বাজারে স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, কাগজি নোট চালু থাকে কিন্তু কাগজি নোটের মূল্য স্বর্ণের মাধ্যমে স্থির থাকে। **দ্বিতীয়ত,** স্বর্ণ পিণ্ডমান ব্যবস্থায় জনসাধারণ কাগজি মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ পেতে পারে না, তবে বৈদেশিক পাওনা মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণের যোগান দিয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার একটি নির্দিষ্ট দামে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে। এই ধরনের স্বর্ণমান ভারতে 1927 সাল থেকে 1931 সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

◎ **স্বর্ণ বিনিময় মান ঃ স্বর্ণ বিনিময় মান ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে এই ব্যবস্থায় কোন স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না। সরকার স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ও করে না, তবে বহির্বাণিজ্যের জন্য সরকার দেশে প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করতে রাজি থাকে। ভারতে** 1898 সাল থেকে 1913 সাল পর্যন্ত এই ধরনের স্বর্ণ বিনিময় মান প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে ভারতে কাগজি নোট প্রচলিত ছিল। তবে ভারত সরকার বৈদেশিক লেনদেনের জন্য প্রয়োজন হলে কাগজি নোটের

পরিবর্তে ব্রিটেনের মুদ্রা (ব্রিটিশ পাউন্ড) একটি নির্দিষ্ট হারে যোগান দিতে রাজি ছিল। এক টাকা = এক শিলিং চার পেন্স্ এই বিনিময় হারে ভারত সরকার সকল সময়ে কাগজি নোটকে পাউন্ড শিলিংএ পরিবর্তিত করতে রাজি ছিল এবং ব্রিটেনের পাউন্ড তখন স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইজন্যই ভারতের টাকাকে তখন স্বর্ণ বিনিময় মানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলা হত। স্বর্ণ বিনিময় মান ব্যবস্থায় দেশের প্রচলিত অর্থের বিনিময়ে স্বর্ণ পাওয়া যায় না তবে দেশের প্রচলিত অর্থের বিনিময়ে এরূপ একটি মুদ্রা পাওয়া যায় যে মুদ্রাটি স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

◎ **স্বর্ণ মজুত মান ঃ** এই ব্যবস্থাতেও স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত থাকে না। কাগজি মুদ্রাই বিহিত মুদ্রা রূপে চালু থাকে। তবে সরকার বিনিময় সমতা ভাণ্ডার (exchange equalisation fund) নামে একটি ভাণ্ডার গঠন করে এবং মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ অথবা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে।

6.10. স্বর্ণমানের কার্যপদ্ধতি (How the Gold Standard Works)

যদি কোন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে তাহলে সেই দেশের স্বর্ণের যোগানের উপর টাকার যোগান নির্ভর করে। স্বর্ণের যোগান বাড়লে টাকার যোগান বাড়ে আবার স্বর্ণের যোগান কমলে টাকার যোগান কমে। তাছাড়া স্বর্ণমান প্রচলিত থাকলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ বন্টিত হয়ে যায় এবং সকল দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কোন একটি দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত রয়েছে। এখন যদি ঐ দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে ঐ দেশ থেকে স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি করা হবে। ফলে ঐ দেশে স্বর্ণের যোগান কমে যাবে এবং ঐ দেশে অর্থের পরিমাণও কমে যাবে। ঐ দেশে অর্থের পরিমাণ কমে গেলে ঐ দেশের দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর কমবে। দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর কমলে ঐ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বেশি পরিমাণে বিদেশের বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হবে এবং তার ফলে ঐ দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে। এইভাবে স্বর্ণ যাতায়াতের মাধ্যমে দেশে আমদানি এবং রপ্তানির সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বর্ণমান কার্যকর হওয়ার জন্য দুটি শর্ত পালিত হওয়া দরকার। এই শর্ত দুটিকে স্বর্ণমানের নিয়ম (Rules of the gold standard game) বলা হয়। **একটি শর্ত** এই যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বর্ণের যাতায়াতে কোনরূপ বিধিনিষেধ থাকবে না। **দ্বিতীয় শর্ত** হ'ল স্বর্ণ আমদানি এবং রপ্তানির ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তরের উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে সেই প্রতিক্রিয়াকে প্রতিরোধ করার জন্য সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোনরূপ পাল্টা ব্যবস্থা নেবে না।

এই দুটি শর্ত যদি সব দেশ পালন করে এবং সব দেশেই যদি স্বর্ণমান চালু থাকে, তাহলে সকল দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভারসাম্য আসবে। কিন্তু যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণের যাতায়াত বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে বৈদেশিক বাণিজ্যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভারসাম্য আসবে না। আবার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার নীতির দ্বারা অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের উপর স্বর্ণ যাতায়াতের প্রতিক্রিয়াকে প্রতিরোধ করে তাহলেও স্বর্ণমান সফল হতে পারে না।

6.11. স্বর্ণমানের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Gold Standard)

স্বর্ণমানের কতকগুলি সুবিধা রয়েছে। **প্রথমত,** কোন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকলে সেই দেশে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থাকে না। স্বর্ণমান প্রচলিত থাকলে যথেচ্ছ পরিমাণ কাগজি নোট প্রচলন করা যায় না। স্বর্ণের যোগান বাড়লে তবেই অর্থের যোগান বাড়ানো সম্ভব হয়। যথেষ্ট পরিমাণ সোনা মজুত না থাকলে সরকার অধিক পরিমাণ কাগজি নোট ইস্যু করতে পারে না। এর ফলে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, স্বর্ণমান ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে বিনিময় হারের স্থিরতা রক্ষিত হয়। দুটি দেশের মধ্যে যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে এবং দুটি দেশই যদি স্বর্ণমানে থাকে তাহলে প্রতিটি দেশের মুদ্রার মূল্য স্বর্ণের মাধ্যমে স্থির থাকে। প্রতিটি দেশের মুদ্রার মূল্য স্বর্ণের মাধ্যমে স্থির থাকার জন্য একটি মুদ্রার মূল্য অন্য মুদ্রার অঙ্কে সকল সময়েই স্থির থাকে। একটি দেশের মুদ্রার বিনিময়ে অন্য দেশের মুদ্রার কত ইউনিট পাওয়া যায় সেটাকে মুদ্রা দুটির মধ্যে বিনিময় হার বলে। স্বর্ণমানের সময় বিনিময় হার মোটামুটি স্থির থাকে। এতে ব্যবসায়ীদের এবং বিনিয়োগকারীদের বিশেষ সুবিধা হয়। **তৃতীয়ত,** প্রতিটি দেশই স্বর্ণমানের শর্তাবলী পালন করলে অর্থাৎ প্রতিটি দেশই যদি স্বর্ণের অবাধ আমদানি এবং রপ্তানি করতে দেয় তাহলে বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনা-আপনি ভারসাম্য স্থাপিত হয়। কোন দেশেই বৈদেশিক বাণিজ্যে দীর্ঘদিন ঘাটতি থাকে না। **চতুর্থত,** যদি সমস্ত দেশেই স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে এবং সেই সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রাও প্রচলিত থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেনদেনে সুবিধা হয় কারণ স্বর্ণমুদ্রা সব দেশই গ্রহণ করতে রাজি থাকে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। **সবশেষে,** বলা যায় যে দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকলে দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর মোটামুটি স্থির থাকে। যেহেতু অর্থের যোগান দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয় সেজন্য মূল্যস্তর খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। স্বর্ণমান প্রচলিত থাকলে এই জন্য মূল্যস্তর মোটামুটি স্থির থাকে।

তবে স্বর্ণমানের কতকগুলি **অসুবিধাও** আছে এবং এই সমস্ত অসুবিধার জন্যই স্বর্ণমান পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছে। সেই অসুবিধাগুলিকে এখন আমরা উল্লেখ করতে পারি। **প্রথমত,** আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বর্ণমান সফলভাবে কার্যকর হওয়ার জন্য প্রত্যেক দেশকে দুটি শর্ত পালন করতে হবে। যেমন এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্বর্ণের যাতায়াতে কোন বাধা নিষেধ থাকবে না এবং স্বর্ণের যাতায়াতের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের উপর যে প্রভাব পড়বে সেই প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য কোন দেশের কর্তৃপক্ষ কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। বাস্তবে কিন্তু দেখা যায় যে কোন দেশই এই শর্তগুলি মানতে রাজি থাকে না। যেমন কোন দেশ থেকে স্বর্ণের রপ্তানি আরম্ভ হলেই ঐ রপ্তানি বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আবার কোন দেশে স্বর্ণের আমদানি ঘটতে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সেই অনুপাতে টাকার যোগান না বাড়িয়ে মজুত সোনার পরিমাণ বাড়াতে থাকে। এই কারণে স্বর্ণমান ব্যবস্থা সফল হ'তে পারে না। **দ্বিতীয়ত,** স্বর্ণমান প্রচলিত থাকলে মূল্যস্তর যে সকল সময় স্থির থাকে এটি সত্য নয়। সোনার উৎপাদন বাড়লে মূল্যস্তর বাড়ে আবার সোনার উৎপাদন কমলে মূল্যস্তর কমে। **তৃতীয়ত,** স্বর্ণমান ব্যয় বহুল। স্বর্ণমান চালু রাখতে হলে অনাবশ্যক বহু পরিমাণ সোনা মজুত রাখা প্রয়োজন। যেখানে কাগজি টাকা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে সেখানে সোনার প্রচলন অযথা অপচয় মাত্র। কাগজি মুদ্রা প্রচলন করে সোনাকে অন্য কোন কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। **চতুর্থত,** স্বর্ণমানকে সুসময়ের বন্ধু বা সুদিনের মান (Fair weather standard) বলা হয় তার কারণ যতদিন দেশের অর্থনীতিতে সুদিন বা সুসময় দেখা দেয়, যতদিন বিদেশ থেকে দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করে, ততদিন এটি সফলতার সঙ্গে কাজ করে। কিন্তু যখন দেশ থেকে স্বর্ণ বাইরে চলে যায় তখন আর এই মুদ্রা মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। **সবশেষে,** বলা যায় যে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কোন দেশ স্থায়ীভাবে অর্থসংক্রান্ত কোন নীতি গ্রহণ করতে পারে না। তার কারণ এই নীতি স্বর্ণের গমনাগমনের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া সব দেশেই স্বর্ণমান চালু থাকলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে কোন দেশের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে অতীতে স্বর্ণমান আদর্শ মুদ্রা ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হ'লেও বর্তমানে কোন দেশই স্বর্ণমানকে গ্রহণযোগ্য মনে করে না। সেজন্য বর্তমান পৃথিবীর কোন দেশেই আর স্বর্ণমান প্রচলিত নেই। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই এখন কাগজি মুদ্রা প্রচলিত।

6.15 কাগজি মুদ্রা প্রচলনের নীতি
(Principles of Note Issue)

কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজি মুদ্রার প্রচলন করে। যেমন ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কাগজি নোট ইস্যু করার একছত্র অধিকার দেওয়া হয়েছে। এখন কাগজি মুদ্রা প্রচলন কীভাবে

অর্থাৎ কী নীতির ভিত্তিতে হয় সেটা দেখা যাক। **কাগজি মুদ্রা প্রচলন সম্পর্কে দুটি প্রধান নীতি উল্লেখ করা হয়। একটিকে বলা হয় কারেন্সী নীতি** (Currency Principle) এবং **অপরটিকে বলা হয় ব্যাঙ্কিং নীতি** (Banking Principle)। **কারেন্সী নীতি অনুযায়ী কাগজি মুদ্রা ধাতব মুদ্রার বিকল্প। সুতরাং কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য** সমপরিমাণ **ধাতব মুদ্রার রিজার্ভ রাখতে হবে।** অর্থাৎ যে পরিমাণ কাগজি মুদ্রা ইস্যু করা হচ্ছে সমমূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হবে। এর ফলে কাগজি মুদ্রার পরিবর্তে কোন ব্যক্তি স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্য মুদ্রা দাবি করলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সেই দাবি মেটাতে সক্ষম হবে। এই নীতি গৃহীত হলে অত্যধিক কাগজি মুদ্রা প্রচলনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। **অন্যদিকে ব্যাঙ্কিং নীতিতে বলা হয় যে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই কাগজি মুদ্রার প্রচলন করা হয়। সুতরাং কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য কী পরিমাণ রিজার্ভ রাখতে হবে তা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থির করে দেবে।** এ সম্পর্কে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম থাকলে তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য **বর্তমানে সমস্ত দেশেই এই ব্যাঙ্কিং নীতি অনুসরণ করা হয়।** কারেন্সি নীতি বর্তমানে কোন দেশেই অনুসৃত হয় না।

বিভিন্ন দেশে কাগজি মুদ্রা প্রচলনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এ সম্পর্কে চারটি পদ্ধতি আমরা উল্লেখ করতে পারি।

◎ **নির্দিষ্ট ফিডিউসিয়ারী পদ্ধতি** (Fixed Fiduciary System) : এই পদ্ধতি অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সীমা পর্যন্ত কাগজি মুদ্রা ছাপানোর জন্য কোন সোনা জমা রাখতে হয় না। ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণকে ফিডিউসিয়ারি সীমা (Fiduciary limit) বলে। ঐ সীমার অতিরিক্ত কাগজি নোট প্রচলন করতে হলে যে পরিমাণ অতিরিক্ত কাগজি নোট প্রচলন করা হবে ঠিক সেই পরিমাণ সোনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুত রাখতে হবে। ইংল্যান্ডে পূর্বে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি এই যে কিছু পরিমাণ কাগজি নোট সর্বদাই জনসাধারণের হাতে থাকবে। এগুলি ভাঙানোর জন্য বা এদের পরিবর্তে সোনা নেওয়ার জন্য কেউ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে আসবে না। কিন্তু এর অধিক পরিমাণ নোট দেশে প্রচলিত থাকলে সেই পরিমাণ নোট ভাঙানোর জন্য বা সোনায় রূপান্তরিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে উপস্থাপিত করা হতে পারে এবং এর জন্য স্বর্ণ বা ধাতু মুদ্রা দিতে সরকারকে বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হবে। সেজন্যই নির্দিষ্ট সীমার ঊর্ধ্বে যে নোট চালু করা হবে সেই নোটের সমপরিমাণ সোনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে মজুত করে রাখতে হবে। এই পদ্ধতিতে যথেচ্ছ নোট ইস্যু করা যায় না বলে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থাকে না। বর্তমানে অবশ্য এই পদ্ধতি প্রায় কোন দেশেই প্রচলিত নেই।

◎ **উচ্চতম ফিডিউসিয়ারী পদ্ধতি** (Maximum Fiduciary System) : এই পদ্ধতি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কোনরূপ মজুত না রেখেই কাগজি নোট প্রচলন করা সম্ভব। সাধারণত ঐ নির্দিষ্ট সীমা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরে ধার্য করা হয়। এর ফলে বাস্তবিক কোনরূপ রিজার্ভ না রেখেই কাগজি মুদ্রা প্রচলন করা যায়। পূর্বে ফ্রান্সে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে এই পদ্ধতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজনমত নোট প্রচলন করতে পারে। নোট প্রচলনের জন্য আনুপাতিক হারে সোনা বা রূপো জমা রাখার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া নোট প্রচলনের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট থাকার জন্য মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কাও থাকে না। সোনা বা রূপো মজুত রাখার কোন বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে নোট প্রচলন ব্যবস্থা স্থিতিস্থাপক হয়। অর্থাৎ সহজেই নোটের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

◎ **আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি** (Proportional Reserve System) : এই প্রথা অনুযায়ী মোট কাগজি মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত রিজার্ভ স্বর্ণে বা বৈদেশিক মুদ্রায় রাখতে হয়। সাধারণত যত টাকার নোট প্রচলন করা হয় তার শতকরা 25 ভাগ থেকে 40 ভাগ পর্যন্ত মূল্যের স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখা হয়। 1956 সালের পূর্বে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই পদ্ধতি অনুসরণ করত। 1956 সালের পূর্বে কাগজি মুদ্রা ছাপানোর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ইস্যু করা কাগজি মুদ্রার 40% স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রায় জমা রাখতে হত। এই পদ্ধতিতে কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য সম পরিমাণ রিজার্ভ রাখতে হয় না। মোট কাগজি মুদ্রা যা প্রচলিত হয় তার একটি অংশই রিজার্ভ আকারে রাখতে হয়। এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে যখন অতিরিক্ত নোট ইস্যু করার

প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন প্রয়োজনীয় সোনা বা বৈদেশিক মুদ্রার মজুত না থাকলে অতিরিক্ত নোট ইস্যু করা সম্ভব হয় না। ফলে কাগজি মুদ্রার যোগান বিশেষ নমনীয় (Flexible) হয় না। তাছাড়া যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে মজুত সোনা বা বৈদেশিক মুদ্রা কমে যায় তখন যতটা সোনা বা বৈদেশিক মুদ্রা কমল তার থেকে অধিক পরিমাণ নোটের প্রচলন কমিয়ে ফেলতে হয় নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রাখার জন্য। তাছাড়া এই পদ্ধতি বহুল কারণ অনেকখানি সোনা অকারণে অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে থাকে। আবার, সোনার মজুত প্রচলিত নোটের মূল্য অপেক্ষা কম বলে জনসাধারণ চাইলে জনসাধারণকে নোটের পরিবর্তে সোনা দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং মুদ্রা ব্যবস্থায় জনসাধারণের আস্থার অভাব দেখা দিতে পারে। আবার যদি মুদ্রা ব্যবস্থায় জনসাধারণের আস্থা থাকে, তাহলে সোনা মজুত রাখার কোন প্রয়োজনই নেই।

◎ **সর্বনিম্ন রিজার্ভ পদ্ধতি** (Minimum Reserve System) : এই পদ্ধতি অনুসারে কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য একটা নিদিষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ রাখতে হয়। ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ রিজার্ভকে সর্বনিম্ন রিজার্ভ বলা হয়। ঐ নিম্নতম রিজার্ভ রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যত খুশি পরিমাণ কাগজি নোট প্রচলন করতে পারে। 1956 সালের পর থেকে এই পদ্ধতিটি ভারতে চালু রয়েছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 115 কোটি টাকার সোনা এবং 85 কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা জমা রেখে যে কোন পরিমাণ নোট প্রচলন করতে পারে। এই প্রথার ফলে কাগজি মুদ্রার প্রচলন ব্যবস্থা খুবই নমনীয় হয়েছে কারণ ন্যূনতম রিজার্ভ রেখে প্রয়োজনমত কাগজি নোটের যোগান সহজেই বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু এই প্রথার প্রধান অসুবিধা এই যে এর ফলে কাগজি মুদ্রা অত্যধিক পরিমাণে ছাপানোর বিপদ থাকে এবং তার ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা দেখা দেয়।

নোট প্রচলনের যে চারটি পদ্ধতি উপরে বর্ণনা করা হ'ল তাদের প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু দোষ ত্রুটি রয়েছে। এই চারটি প্রথার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কোন্‌টি তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। দেশের অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী কাগজি মুদ্রা প্রচলন পদ্ধতির তারতম্য ঘটে থাকে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ব্যয় সংকোচ, স্থিতিস্থাপকতা, নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্ব এইগুলি যে পদ্ধতিতে পাওয়া যায় সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করা উচিত। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য দুটি নীতি প্রায় সব দেশেই অনুসরণ করা হয়। প্রথমত, কাগজি মুদ্রা প্রচলনের জন্য প্রত্যেক দেশেই কিছু পরিমাণ রিজার্ভ সোনা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, রিজার্ভের পরিমাণ কত হবে তা বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সঞ্চিত সোনা এবং বৈদেশিক মুদ্রা বৈদেশিক লেনদেনের স্বল্পকালে ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। সুতরাং স্বল্পকালে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে।

6.17. ভারতে অর্থের যোগানের পরিমাপক
(Measures of Money Supply in India)

অর্থের যোগান বলতে জনসাধারণের হাতে অর্থের পরিমাণকে বোঝায়। এখানে জনসাধারণ বলতে সরকার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ব্যতীত প্রতিটি অর্থনৈতিক এককে বোঝায়। সরকার এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে জনসাধারণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না কারণ এরাই হল অর্থের যোগানদাতা। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নিয়ে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গঠিত।

অর্থের যোগান বোঝানোর জন্য এপ্রিল 1977 থেকে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চারটি পরিমাপক গ্রহণ করেছে। এগুলি M_1, M_2, M_3 এবং M_4 এই চারটি সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। M_1 এর সংজ্ঞা হল $M_1 = C + DD + OD$ যেখানে C হল জনসাধারণের হাতে কাগজি নোট ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ, DD হল ব্যাঙ্কগুলির কাছে চাহিদা আমানত এবং OD হল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে অন্যান্য আমানত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে DD বা চাহিদা আমানতের মধ্যে সঞ্চয় আমানতের যে অংশটিকে চেক কেটে তোলা যায় তাকেও ধরা হয়েছে। M_2 হল M_1 এবং ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কের আমানতের যোগফল। আবার M_3 হল

M_1 এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মেয়াদি আমানতের যোগফল। সবশেষে M_3 এবং পোস্ট অফিসের মোট আমানত (*NSC* বাদে) যোগ করলে M_4 পাওয়া যায়। সংকীর্ণ অর্থে, অর্থের যোগান বলতে M_1 কেই বোঝান হয় আর ব্যাপক অর্থে অর্থের যোগান বলতে M_4 কে বোঝান হয়।

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থের যোগানের নতুন তিনটি পরিমাপক ঘোষণা করেছে। এগুলিকে M_1(New). M_2 (new) এবং M_3 (New) এই সংকেত দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে। এর মধ্যে M_1 (New) = M_1 (old). M_2 (New) = M_1 (New) + সঞ্চয় আমানতের মেয়াদি দায় + ব্যাঙ্কের ইস্যু করা আমানত সংসাপত্রের মূল্য + এক বছরের মধ্যে মেয়াদ পূর্ণ হবে এমন মেয়াদি আমানত। M_3 (New) = M_2 (New) + এক বছরের বেশি সময়ের মেয়াদি আমানত + ব্যাঙ্ক কর্তৃক গৃহীত তলবি / মেয়াদি ঋণের পরিমাণ।

লক্ষ করার এই যে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কের আমানতকে পুরানো M_2-এ অন্তর্ভুক্ত করা হলেও নতুন M_2 বা M_3-তে তা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাছাড়া পুরানো M_4 পরিমাপকটিকে এখন বাদ দেওয়া হয়েছে।

সারাংশ

1. **অর্থ কাকে বলে ঃ** যে সম্পত্তিটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হবে, অর্থাৎ যেটি সকলেই নিতে রাজি আছে তাকেই অর্থ বলা হয়। যখন সার্বজনীন গ্রহণ যোগ্যতা আইন দ্বারা বলবৎ করা হয় তখন তাকে বলে আইনসিদ্ধ অর্থ, আর যখন গ্রহণযোগ্যতা প্রথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ঐ অর্থকে বলে প্রথাসিদ্ধ অর্থ।
2. **অর্থের উদ্ভব কখন হ'ল ঃ** মানব সভ্যতার শুরুতে অর্থের প্রচলন ছিল না। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের ভোগের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি দূর করার জন্যই অর্থের উদ্ভব হয়েছে।
3. **দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধা ঃ** দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি হ'ল ঃ পারস্পরিক অভাবের দ্বৈত সমাপতন না হওয়া, দ্রব্যের অবিভাজ্যতা, সাধারণ মানদণ্ডের অভাব, সঞ্চয় করার অসুবিধা, মোট উৎপাদনের হিসাব করার অসুবিধা, সীমিত বাজার প্রভৃতি।
4. **অর্থের কাজ ঃ** অর্থের চারটি কাজ ঃ বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, ঋণশোধের বা পরে মূল্য শোধের মাপকাঠি এবং সঞ্চয়ের উপায় হিসাবে কাজ করা।
5. **অর্থের বিবর্তন ঃ** অতীতে কোন দ্রব্যকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে নেওয়া হ'ত। দেখা গেছে যে, কোন দ্রব্যকে আদর্শ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে হ'লে তার কতকগুলি গুণ থাকা দরকার ঃ যেমন সহজ পরিবহণ যোগ্যতা, স্থায়িত্ব, সহজ বিভাজ্যতা, দুষ্প্রাপ্যতা, সহজেই যেন চেনা যায় এবং নকল করা কঠিন। এই গুণগুলি সরকারী সিলমোহর দেওয়া ধাতুমুদ্রায় আছে বলে এগুলি অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাগজি নোটেরও এই গুণগুলি আছে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে ব্যাঙ্ক আমানতও অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
6. **বিভিন্ন ধরনের অর্থ ঃ** নানা মানদণ্ডের ভিত্তিতে অর্থকে নানাভাবে শ্রেণি বিভাগ করা যায়। প্রচলনের ভিত্তিতে প্রকৃত অর্থ ও হিসাব নিকাশের অর্থ—এই দুই ভাগে অর্থকে ভাগ করা যায়। প্রকৃত অর্থ প্রকৃতই লোকেদের হাতে হাতে ফেরে। কিন্তু হিসাব নিকাশের অর্থের অস্তিত্ব শুধু হিসাবের খাতাতেই সীমাবদ্ধ। বস্তুগত গঠনের ভিত্তিতে ধাতব অর্থ এবং কাগজি অর্থ এই দুই ভাগে অর্থকে ভাগ করা যায়। গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে অর্থকে আইনসিদ্ধ অর্থ ও ঐচ্ছিক অর্থ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আইনসিদ্ধ অর্থ সকলেই নিতে বাধ্য কিন্তু ঐচ্ছিক অর্থ সকলে নিতে রাজি নাও হ'তে পারে। ব্যাঙ্ক আমানত ঐচ্ছিক অর্থ। নিদর্শনের ভিত্তিতে অর্থকে প্রামাণিক অর্থ এবং টোকেন অর্থ এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রামাণিক অর্থের দ্রব্যমূল্য এবং অর্থমূল্য পরস্পর সমান। টোকেন অর্থের ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য অর্থমূল্য অপেক্ষা কম। বর্তমানে সকল দেশেই টোকেন অর্থ প্রচলিত।
7. **কাগজি মুদ্রা ঃ** কাগজি মুদ্রার দ্রব্যমূল্য এর অর্থমূল্য অপেক্ষা কম। কাগজি মুদ্রা সকলে গ্রহণ করতে রাজি কারণ সরকারের আদেশ বলে এই মুদ্রা প্রবর্তিত হয়েছে। কাগজি মুদ্রা রূপান্তরযোগ্য অথবা অ-রূপান্তরযোগ্য হ'তে পারে। কাগজি মুদ্রার কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে। তবে অসুবিধার তুলনায় সুবিধাই বেশি। সেজন্য সব দেশেই এখন কাগজি মুদ্রা চালু আছে।